# চেনা ছকে অচেনা কথা—১

(পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠক্রম অনুসারে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা)

(শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য)

AHEAD Initiatives

(অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর একটি বিশেষ উদ্যোগ)

# চেনা ছকে অচেনা কথা-১

(পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠক্রম অনুসারে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা)

(শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য)

## (১)

(তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য)

AHEAD Initiatives

(অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌-এর একটি বিশেষ উদ্যোগ)

# চেনা ছকে অচেনা কথা

(Chena Chake Ochena katha)

ভাবনা ও পরিকল্পনায়ঃ
দিব্যগোপাল ঘটক
প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা শিক্ষা  বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাস্তব রূপদানেঃ

শ্রীমতি স্বপ্না দাশ
সৃজনমূলক কৃত্যালি বিশেষজ্ঞ

শ্রীমতি সুদেষ্ণা মৈত্র
বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক

শ্রীমতি সুস্মিতা ঘটক
শিশুশিক্ষা বিশেষজ্ঞ

শ্রী দেবাশিস মণ্ডল
প্রধান শিক্ষক ও আই সি টি পরামর্শদাতা

শ্রীমতি দেবাহুতি মুখোপাধ্যায়
পুস্তক প্রকাশক বিশেষজ্ঞ

অদ্রীশ দাশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ বিশেষজ্ঞ

প্রকাশকঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌
৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১
ফোনঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯

ইমেলঃ ahead@aheadinitiatives.in

প্রকাশ কালঃ ২০২০

# প্রাসঙ্গিক কথা

শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষা কোনও 'ইভেন্ট' নয়। সমাজ-সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনের অঙ্গ। শিক্ষা কেবল বই পড়া, মুখস্ত করা আর পরীক্ষার দেওয়ার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। তা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাকে জীবনমুখী করার একটা প্রচেষ্টা চলছে। সরকার এবিষয়ে যথেষ্ট সজাগ। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের আবাসভূমির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের একটা সংমিশ্রণ ঘটানোর প্রয়াস দেখা যাচ্ছে সর্বস্তরে। যদি আমরা ২০০৫ সালের 'জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা'য় আলোকপাত করি তাহলে দেখব, সেখানে বলা হয়েছে শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক পড়াশোনাই শিক্ষকের একমাত্র হাতিয়ার নয়। পাশাপাশি শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা ও মানসিক আকাঙ্ক্ষা পূরণেও সহায়তা করতে হবে। শিশুদের জ্ঞানের মধ্যে স্থানীয় জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের একটা সংযোগ ঘটাতে হবে, যাতে শিশুরা তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে একাত্ম হতে পারে। শিশুর পরিবার, গোষ্ঠী, ভাষা এবং সংস্কৃতি যে প্রকৃত মূল্যবান সম্পদ তা তাদের অনুভাব করানো প্রয়োজন।

শিশুদের শিক্ষা বিদ্যালয়ের ভেতর এবং বিদ্যালয়ের বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই ঘটে। সেই ভাবনাকে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবই 'পাতাবাহার' ও 'আমাদের পরিবেশ'-এর ভিত্তিতে কিছু বাছাই করা কৃত্যালি নিয়ে আমরা রচনা করেছি 'পাঠভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কৃত্যালির দিশা-পুস্তিকা' নামে তিনটি পৃথক গাইডবুক, যেগুলি শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্থানীয় এলাকার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাতে অনুঘটকের কাজ করবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেরকম ভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করান সেটা করাবেন। তার পাশাপাশি এই কৃত্যালিগুলি সম্পাদন করলে শিশুরা একদিকে যেমন আনন্দ পাবে তেমনই অন্যদিকে হাতে-কলমে কাজ করতে করতে দক্ষতা ও জ্ঞান উভয়ই বাড়াতে পারবে। পাঠগুলির অভ্যন্তরে নিহিত শিশুর সামর্থ্য ও মূল্যবোধের ধারণা বৃদ্ধি করতে যেহেতু সংশ্লিষ্ট কৃত্যালিগুলি নির্মাণ করা হয়েছে, তাই এই উদ্যোগের সঙ্গে সরকারি পাঠক্রম, শিক্ষাদর্শন, শিশুর মনস্তত্ব ও সমাজতত্ত্বের বিশিষ্ট ভাবনাগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। সেগুলিকেই শিক্ষকদের কাছে স্পষ্টভাবে এই দিশা-পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতাও তৈরি হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে মূল্যবোধের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করে তুলবে।

পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার এই দিশা-পুস্তিকাগুলি 'চেনা ছকে অচেনা কথা' নামে এই বই তিনটি আলাদাভাবে রচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর যদি তাদের সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে কৃত্যালিগুলি অনুশীলনের জন্য এই পুস্তিকাগুলিকে অনুমোদন দেন তাহলে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংশ্লিস্ট আবাস-উপযোগী স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার নানান রসদ খুঁজে পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে তাদের জীবনে শিক্ষা কার্যকরীভাবে হয়ে উঠবে প্রাসঙ্গিক। এই দিশা-পুস্তিকাগুলি রূপদান করার জন্য যাঁর বহুমুখী অবদান কখনই ভোলার নয়, তিনি শ্রী দিব্যগোপাল ঘটক মহাশয় (প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)। তাঁর নিবিড় প্রচেষ্টা ছাড়া এই বইটি আমরা কখনই প্রকাশ করতে পারতাম না। এই বইটির সৃজনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তারা হলেন শ্রীমতী স্বপ্না দাশ, সুদেষ্ণা মৈত্র, সুস্মিতা ঘটক, দেবাশিস মণ্ডল, দেবাহুতি মুখোপাধ্যায়, অদ্রীশ দাস ও অমিত দাস। তাঁদের অকুণ্ঠ সহায়তা ছাড়া এই অসম্ভব কাজকে কখনই সুচারুভাবে সম্ভব করা যেত না। 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর বাকি সকল সাথীদের সুপরামর্শ ছাড়া এই বইটি সমৃদ্ধ হতে পারত না। সেকারণে তাদের কাছেও আমরা ঋণী। আমরা মনে করি এই দিশা-পুস্তিকাগুলি তখনই সার্থক হবে যখন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট কৃত্যালিগুলি শ্রেণিকক্ষের ভেতরে এবং বাইরে অনুশীলন করাবেন। আর তাহলেই শিক্ষা হয়ে উঠবে প্রকৃত অর্থে জীবনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, আমরাও সেই অনাগত দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্

কলকাতা

# সূচিপত্র

১। প্রস্তাবনা..... ৫

২। চেনা ছকে অচেনা কথাঃ শিশু শেখে কিভাবে..... ১০

৩। চেনা ছকে অচেনা কথাঃ প্রাসঙ্গিক শিক্ষা..... ১৫

৪। চেনা ছকে অচেনা কথাঃ ভাবনাটিকে রূপদান করতে উদ্যোগ..... ১৯

৫। চেনা ছকে অচেনা কথাঃ কাঙ্খিত সামর্থ্য ও মূল্যবোধের নতুন তরজমা..... ৩৩

৬। তটরেখা সমীক্ষা..... ৪১

৭। সর্বশেষে মোটকথা..... ৪৬

# প্রস্তাবনা

সারা বিশ্বে শিক্ষা এখন এক অত্যাবশ্যক পণ্য। আমাদের দেশেও নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানে শিক্ষার এই চরিত্রের প্রসার ঘটতে চলেছে সর্বত্র। পণ্য মানেই সেখানে আছে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, পুঁজি ও মুনাফা আর শোষিত শ্রমিক মজুর। স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যবস্থায় সমগ্র জীবনবোধের পরিবর্তে একদিকে রয়েছে অত্যাবশ্যক চাহিদার পরিপূরণ, সর্বজনীন জনপ্রিয় ছকে উপভোক্তার সন্তুষ্টিবিধান, বিশ্বজুড়ে সামর্থ্যহীনদের প্রতি হৃদয়হীন বঞ্চনা, অন্যদিকে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠা সীমাহীন সম্পদের অপচয়, পেটের ক্ষুধার পাশাপাশি নীতিহীন মানুষের অতলান্তিক মানসিক দারিদ্র্য, যথেচ্ছ প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ আর অসহায় জীবজগৎ ও স্বয়ংসিদ্ধ মনুষ্য প্রকৃতির বিবেচনাহীন বিনাশসাধন। গত দুশো বছর ধরে ব্রিটিশদের ধাঁচে আমাদের দেশে গণশিক্ষার জনপ্রিয় কাঠামো গড়ে তুলতে গিয়ে আমরা নিজেরাই এই সর্বনাশ ডেকে এনেছি। শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ তা অনুভব করেছিলেন। তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, "যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহার মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা নবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহনির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে"। এক শতাব্দী আগে রবীন্দ্রনাথ যা উপলব্ধি করেছিলেন তা আজও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েনি। ভাল করে নজর করলেই বোঝা যায়, দেশজুড়ে শিক্ষাকর্ম এখন নিতান্তই জরুরি পরিষেবার মতই প্রাণহীন ন্যূনতম কৃত্যালিতে পরিণত হয়েছে। জগৎ ও জীবনকে নিবিড়ভাবে চাক্ষুষ করা আর তা থেকে স্বকীয় পদ্ধতিতে নিজের মালমশলা সন্ধান করে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়ে উঠছে না শিশুর মধ্যে। তার মগজ এখন এমন একটি কারখানার মতো যেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফরমাস মতো মালপত্র আর পূর্ব নির্ধারিত যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। জন্মের পর থেকেই যে ছিল স্বাধীন মরমী সৃজনশীল তন্তুবায়ের মতো, যার দৃষ্টিতে থাকত অবাক বিস্ময়, সুন্দর প্রকৃতিই যার সরল বোধ, যার কথায় ও কাজে উঠে আসত অনন্য হৃদয় সম্পদ আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়, সে এই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে 'দাসে' পরিণত হল। পরিস্থিতির চাপে, কারণে-অকারণে অনেক উপকরণ সে সংগ্রহ করল ঠিকই কিন্তু সে হারিয়ে ফেলল তার নিজস্ব নির্মাণশৈলী, জীবনবোধ আর আত্মবিশ্বাস। শিশুদের শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখলেন, "মালমশলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর, তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্মাণের উপযুক্ত এত ইট পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্বে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটাই একটা মস্ত ভুল"। ইদানিং শিক্ষাক্ষেত্রে এই সংগ্রহ ও নির্মাণের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রতিটি সমাজে ক্রমে এঁটে বসা নির্মাণ সমারোহের মধ্যেই বিশ্বজুড়ে এক

নতুন বিনির্মাণের চোরা স্রোত বইতে শুরু করেছে। ফলে উঠে আসছে এক নতুন সমীকরণ, একটি নয়া সংশ্লেষণ (Synthesis), এক কথায় প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক শিক্ষার (Contexcutal and place based education) মতো এক নতুন পরিসরের আবশ্যকতা।

শিক্ষাকে 'প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক' হতে গেলে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হতে হবে। প্রথমত প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক শিক্ষার জন্য কোনও প্রথাগত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এই ব্যবস্থায় সবাই শিক্ষক। প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজের মানুষজন, শিশুর বন্ধুরা, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক, সমাজের চর্চিত লোকশিল্প ও লোকসৃষ্টি, সবাই তার শিক্ষক। শিশু দু'চোখ ভরে পর্যবেক্ষণ করে; দু'কান দিয়ে নানান শব্দ শ্রবণ করে; প্রকৃতির সঙ্গে, পশুপাখির সঙ্গে, মানুষজনের সঙ্গে, এমনকি কখনও কখনও নিজের সঙ্গেও বলাবলি করে। কিছু বোঝে আবার কিছু বোঝে না। তবে নিজের মতো করে অর্থোদ্ধারের চেষ্টা করে। কার্যকারণ সম্পর্ক চিহ্নিত করে। কোনটা ঠিক, কোনটা ঠিক নয় তা নিয়ে ধারণা স্পষ্ট করে ফেলে, সে কল্পনা করে, গান গায়, নাচে-খেলে-পুতুল তৈরি করে। এইভাবে জীবনের প্রথম কয়েক বছরেই তার মধ্যে জন্ম নেয় যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-বিশ্লেষণ-সৃজন ক্ষমতা। দ্বিতীয়ত শিশু বিদ্যালয়ে না গেলেও সে অবলীলায় বেশ কয়েকটা জীবন-দক্ষতায় (Life skill) সাবলীল হয়ে উঠতে পারে।

(ক) বাচন ক্ষমতা (Communication skill)।

(খ) প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষকে দেখে তাদের আচরণ, সংকেত, ভাষা ও শব্দ বুঝতে পারার ক্ষমতা।

(গ) লৌকিক মাধ্যম ব্যবহার করার ক্ষমতা ও তার স্বতঃস্ফূর্ত সৃজন ক্ষমতা।

(ঘ) স্বেচ্ছায় পেশা ও বৃত্তি নির্বাচন।

(ঙ) ওই পেশা ও বৃত্তিকে সার্থকতায় নিয়ে যেতে পারা ও ধীরে ধীরে স্বাধীন ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা।

(চ) সামাজিক সম্পর্ক রক্ষায় পটুতা।

(ছ) মানসিক গণনে (Mental maths) সহজাত ক্ষমতা।

(জ) অক্লান্ত দৈহিক পরিশ্রমে সামর্থ্যে বিশ্বাসী।

(ঝ) ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধকে পাথেয় করা।

(ঞ) প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা, মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের বিকাশ।

এদেশের চালু পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, উপরে উল্লেখিত গুণগুলিই মূলত শিশুর প্রত্যাশিত সামর্থ্য (Desired competency) হিসাবে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু যা ঘটে তা হল, বিদ্যালয় ব্যবস্থা থেকে এই গুণগুলিকে অর্জন করা শিশুর পক্ষে মোটেই সহজ হয় না। এর বড় কারণ হল বিদ্যালয় কৃত্যালিতে একপ্রকার পূর্ব নির্ধারিত সিস্টেম চালু রয়েছে। এটি একঘেঁয়ে, দৈনন্দিন, প্রাণহীন কর্মধারা। এটি সমাজের লৌকিক জীবনচর্চা ও শিশুর ব্যক্তিগত জীবনশৈলীর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়। এখানেই বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত ব্যর্থতা।

তাহলে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা কী করেন? পড়ান? লিখতে শেখান? পাঠ্য বইয়ের প্রশ্নোত্তর করান? পাশ করান? উঁচু ক্লাসে ওঠার শংসাপত্র দেন? এটির জন্য কি কোনও "জাতির কারিগর" প্রয়োজন হয়? যে কোনও প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষই কি এটুকু কাজ করে দিতে পারেন না? উঁচু ক্লাসগুলিতে অনলাইন কোর্স করলেই তো এই উদ্দেশ্য সহজেই সাধিত হয়ে যায়! আসলে বিশ্বজুড়ে 'কার্যকরী সাক্ষরতা ও গাণিতিক কৃত্যালি' এখন বিদ্যালয় ব্যবস্থার একমাত্র কর্মসূচি হয়ে পড়েছে। এখন আর শিক্ষককে কাছে পাওয়া বা চাক্ষুষ দেখার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে না। শিশু কিশোরেরা এখন বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহ বোধ করে না। বিকল্প প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে। তার সঙ্গে আমাদের রাজ্যে প্রাইভেট টিউশানির মতো বিকল্প ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দিন দিন। পনেরো বছর আগে দেখতাম বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর হাজিরা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে নবম, দশম শ্রেণিতেও এই রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে এই প্রবণতা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্তও হয়তো ছড়িয়ে পড়বে। তাহলে এর প্রতিকারের উপায় কী? বিদ্যালয় কি এভাবেই তার প্রথাগত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দিনে দিনে হারাবে?

অন্যদিকে এটিও সত্য যে, প্রথাগত বিদ্যালয় ছাড়া গণশিক্ষার ধারা প্রবাহমান রাখা সম্ভব নয়। আবার এটিও অস্বীকার করার উপায় নেই, সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার যে গুণ আজও মানুষকে সমাজকাঠামোয় দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সাহায্য করছে তা শৈশবে নানান সামাজিক অভিজ্ঞতা আর বিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক কৃত্যালির অবদান। অতীতেও বিদ্যালয়ে পড়ানোর চেয়ে শিশুর হৃদয়বৃত্তি ও হাতে-নাতে কাজের অভিজ্ঞতার ওপর বেশি জোর দেওয়া হত। পাড়ায় আজ যে মানুষটি সফলভাবে ক্যাটারিংয়ের ব্যবসা করছেন, তিনি শৈশবে হয়তো সরস্বতী পুজো, বার্ষিক অনুষ্ঠান আর নানান সামাজিক কাজে নেতৃত্ব দিতেন। দেখা যাবে সেটা তিনি করতেন আনন্দের সঙ্গেই। নিতান্তই নম্বর পাওয়ার জন্য বা পাঠ্যসূচিতে আছে বলে নয়। এটি একটি বাস্তব ঘটনা। আজকাল এই তফাতটা ভীষণই চোখে পড়ছে। দেখে মনে হয়, শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিতান্তই এক কর্মচারীতে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অভাব ঘটেছে এযুগের উপযোগী, মুক্তমনের, বৈশ্বিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, দক্ষ, সামাজিক ব্যক্তিমানুষ তৈরি করার আদর্শ ও উদ্যোগের। শিশুদের কাছে ফিরে যাওয়ার ডাক তাই বোধ হয় সবার কাছেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তা না হলে, আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা আত্মমগ্ন, লৌকিক, সামাজিক ও পরিবেশ জ্ঞান বহির্ভূত, উচ্চাকাঙ্খী, স্বল্পশিক্ষিত ও যান্ত্রিক স্বভাবের, তারাই আগামীদিনে দেশের প্রশাসন, পঞ্চায়েত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ সর্বত্র সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখল করে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মধ্য মানের যন্ত্রে পরিণত করবে। শিশুরা পরিবার ও সমাজ থেকে যেটুকু শুভবুদ্ধি ও কর্মযোগ শিখেছিল, তাও তার জীবন থেকে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে পড়বে। এক ছাঁচে ঢালা, এক সময় সারণীতে বাঁধা, এক পাঠ্যসূচির অধীনে নিয়ন্ত্রিত শৈশব তার নিজস্ব মুক্ত মেধা এবং বোধ ধীরে ধীরে হারাতে চলেছে, যা কম আশঙ্কার কথা নয়। দেখলে হায়দ্রাবাদ, দিল্লি আর নিউটাউনকে যেমন আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না, তেমনই একটি উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশুকে দেখলে মনে হবে সরকার বাড়ির কালো ছেলের মতো। তার খাদ্যাভ্যাস, ভাল লাগার বিষয়, সংস্কৃতির চর্চা, মনোযোগের ধরন, ইচ্ছার বিষয়, সম্পর্ক রক্ষার বৈশিষ্ট্য, সবটাই মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের মতন দেখানোর চেষ্টা বহুমুখী মানবসভ্যতার পক্ষে এক ক্ষতিকারক দিক। এই সাংস্কৃতিক সমজাতীয়করণ (Cultural homogenaration) প্রক্রিয়া গত একশো বছর ধরে এদেশে প্রবল রূপ নিয়েছে। ব্রিটিশদের কাছ থেকে আমরা এটা শিখেছি। এই সমজাতীয়করণের ঘৃন্য প্রচেষ্টাকে সচেতনভাবে বন্ধ করতে হবে। চল্লিশ বছর আগেও কুমোরপাড়াতে একটি ছেলে কালো মাটি পেলে, তাকে এক অনিন্দ্যসুন্দর ভাস্কর্যে রূপদান করতে পারত। আজ সেইরকম একটি ছেলে শিক্ষকের কাছ থেকে শেখে 'মাটি কয় প্রকার' এবং মুখস্ত করে মাটি নিয়ে যাবতীয় পাঠ। পরীক্ষা দিয়ে কোনও রকমে পাশ করে সে। বাবা, কাকার মতো 'নোংরা' কাজ সে এখন করে না। সে বড় হয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে এই আশায় থাকে। দু-একজন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অবশ্যই হবে। কিন্তু তা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। নিজের সমাজ ও পরিবেশ থেকে রসদ শোষণ করেই শিশু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে-এই আশা সমাজ ও অবিভাবক দু'জনেরই করা উচিত। গ্রামীণ সভ্যতার প্রতি, পারিবারিক পেশা ও বৃত্তির প্রতি হীনমন্যতা তৈরি হওয়া কতখানি ক্ষতিকর প্রবণতা তা ভবিষ্যতে ভারতীয় সমাজ বুঝতে পারবে।

তাহলে উপায় কী? শিশুর নিজস্ব ক্ষমতার উপর আস্থাহীনতা, মানসিক পুষ্টি বিধানে ব্যর্থ উপকরণ যোগান 'সবার জন্য শিক্ষা' সরবরাহে রেশন ব্যবস্থার প্রয়োগ, স্মৃতির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা আর সামাজিক প্রক্রিয়ায় শিখনের প্রতি অবহেলা-এসবের মধ্যে দিয়ে আজ যে স্তরে বিদ্যালয় কৃত্যালি পৌঁছছে, তাতে সমাধানের আটটি সূত্র অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেইঃ

(১) পাঠক্রম অনুসারে শিশুর শিক্ষাকে সামাজিকীকরণ করার প্রয়োজন। তাই পাঠ্যবই ভিত্তিক প্রথাগত সাক্ষরতা ও গাণিতিক কৃত্যালির সময় হ্রাস করা দরকার। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হাতে-নাতে কাজ করতে করতে ভাষা চর্চা, সাহিত্য চর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গণিত চর্চা করতে হবে।

(২) অতি শৈশব থেকে শিশু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে লৌকিক ও স্থানিক জ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাঠ্যসূচির উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং শিশুকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে হবে।

(৩) কথ্য ভাষা সহ শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক জ্ঞান ও বোধকে কখনই 'হীন' প্রমাণিত করার চেষ্টা করা যাবে না, বরং শিশুদের মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে, তাকে সম্মান করেই কৃত্যালি রচনা করতে হবে।

(৪) পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দলবদ্ধ কর্মসম্পাদন, গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি, হাতে-নাতে কাজ করার ধারা, পারস্পরিক কথ্য ভাষার আদানপ্রদান, লৌকিক সৃজনশীল মাধ্যমের ব্যবহার-এইসব কৃৎকৌশলের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে একটি ক্ষুদ্রসমাজে (Society in miniature) পরিণত হতে হবে।

(৫) শিশুর সঙ্গে তার পরিবার ও সমাজ যেমন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে তেমনই প্রয়োজনে মহম্মদকেও পর্বতের কাছে যেতে হতে পারে। বাস্তব পরিবেশ ও সমাজের সবকিছুকে নতুনভাবে চাক্ষুষ করে শিশু তার প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক অভিজ্ঞতাকে পূর্নাঙ্গরূপে গড়ে তুলবে।

(৬) শিশুর কথ্য ভাষা ও শব্দ প্রয়োগকে সম্মান দিয়েই তার মধ্যে প্রয়োজনে মান্য ভাষার বীজ বপন করতে হবে। এক একটি জ্ঞানখন্ড ধরে ধরে ভাষা সঞ্চালনের কৃত্যালি নিবিড়ভাবে না করলে শিশু বিদ্যালয়কে 'নিজের' বলে মনে করবে না। ছাগলের মায়ের 'ছানা হওয়া বা বিয়ানো' শব্দকে যখন ছাগল মায়ের 'সন্তান প্রসব' অথবা 'বিঁচি পুঁতা' শব্দকে মান্য ভাষায় 'বীজবপন'-এ পরিবর্তন করা যাবে, তখনই তার শিখনের ব্যপ্তি প্রকাশ পেতে থাকবে। কথ্য থেকে মান্য ভাষায় শিশুর যাত্রাকে যত্ন করে সংগঠিত করাতে হবে। ছোট ছোট গল্প, ছবি ও পাঠ এবং সহজ পঠন সামগ্রী নিয়ে গড়ে তোলা দরকার এক একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। বইগুলির নিয়মিত চর্চাও চাই।

(৭) শিশুর মধ্যে ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা লৌকিক ও সাংস্কৃতিক বোধ এবং তার নানান সৃজনমূলক অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিতে হবে এবং সেই মতো শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যসূচিকে সুখদায়ক ও মনোরঞ্জনকর করে গড়ে তুলতে হবে। যে কোনও শিক্ষণীয় বিষয় শিশুর অন্তরের কাছাকাছি পৌঁছলে তা তার মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব গঠন করতে সহায়ক হবে।

(৮) মাঝে মাঝে দু-একটা কৃত্যালি করে ফেলা নয়, সারা বছর ধরে প্রতিটি পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষণীয় ধারণাকে কেন্দ্র করে শিশু পরিচালিত (Child-led) কৃত্যালি নির্মাণ করতে হবে এবং শিশুদের মধ্যে একটা স্বাধীন, স্থানিক ও প্রাসঙ্গিক জ্ঞান নির্মাণ প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হবে।

উপরের ভাবনা কার্যকর করতে গেলেই প্রথাগত বিদ্যালয় ব্যবস্থার পরিচিত ফর্ম্যাট ভাঙার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ইভান ইলিচ বা জন হল্ট যে 'বিদ্যালয় মুক্ত সমাজ' (De-schooled society বা Un-schooling)-এর কথা ভেবেছেন সেখানে শিশু নিজের প্রয়োজনে আনন্দের সঙ্গে হয়তো স্বাভাবিক জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগের বিকাশ ঘটাতে পারবে এবং শিক্ষায় এক উদার মুক্ত ধারার প্রবর্তনা করতে পারবে। কিন্তু সে সমাজ আজও অধরা। তবু পৃথিবীর স্বার্থেই সমাজমনস্ক পাঠক্রম ও মুক্ত সমন্বিত শিক্ষা ধারা প্রবর্তনের প্রয়োজন সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে। এরই পথ ধরে চিন্তাশীল ও মুক্ত মনের মানুষ, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের একটি মঞ্চ তৈরি করা খুবই জরুরি। আগামী দিনে পরিবর্তনের দীপ জ্বালাতে হয়তো কয়েকজন শিক্ষককে আজই সলতে পাকানোর কাজ শুরু করতে হবে।

ঠিক এই জায়গাতেই প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক শিক্ষার গুরুত্ব। একে বাদ দিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা হল একটি প্রাণহীন বিদ্যাভ্যাস যজ্ঞ, যেখানে শিশু থাকে মানসিকভাবে অনুপস্থিত। 'অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভ্স্'(Ahead Initiatives) ইতিমধ্যে নিজস্ব চালু কর্মসূচিতে বিদ্যালয় কেন্দ্রিক কৃত্যালির কিছু কিছু প্রয়োগ করে দেখেছেন যে, বিদ্যালয়ের পাঠরত শিশু এবং তাদের অভিভাবক ও শিক্ষক সবাই গৃহীত কৃত্যালিগুলির মধ্য দিয়ে 'পরিবেশ' সম্পর্কে অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে। প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যালয়গুলি তাদের নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে তুলেছেনঃ

- বিদ্যালয় বাগান।
- জৈবসারের উৎপাদন ক্ষেত্র।
- গৃহের আশেপাশে পরিত্যক্ত জমিতে বিকল্প গাছের চাষ, সবজির বাগান, পশুপালন।
- বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- অভিভাবকদের নিয়ে সাংস্কৃতিক চর্চার মঞ্চ (আফটার স্কুল প্রোগ্রাম)।
- পাঠ্যবই থেকে পরিবেশ ভিত্তিক কৃত্যালি চিহ্নিতকরণ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বা নিজেদের বাড়ির

জমিতে তার বাস্তব প্রয়োগ।

- পাঠভিত্তিক নানান দৃশ্য-শ্রাব্য ইউনিট তৈরি করা (শিক্ষকদের মাধ্যমে) ও শ্রেণিকক্ষে তার ব্যবহার।

বিগত কয়েক বছরের সাফল্য শিশুর প্রাসঙ্গিক শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে আরও বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করতে সংগঠনকে উৎসাহিত করেছে। সেটা কখনও শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে, কখনও বিদ্যালয়ের বাইরে সমাজের মধ্যে।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গত বছর থেকে অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভ্স্-এর পক্ষ থেকে তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য এই ধরনের নানান কৃত্যালি তৈরি করার একটি উদ্যোগও নেওয়া হয়। ওই কৃত্যালিগুলির উল্লেখ করে শিক্ষকদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক 'দিশা-পুস্তিকা' রচনারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মূলত দুটি পাঠ্য বইয়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে। এক, 'পাতাবাহার' এবং দুই, 'আমাদের পরিবেশ'। অন্যদিকে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণিতে 'সাহিত্য মেলা' (বাংলা ভাষা), 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' (পরিবেশ বিজ্ঞান), 'আমাদের পৃথিবী' (ভূগোল) এবং 'অতীত ও ঐতিহ্য' (ইতিহাস), এই চারটি পাঠ্যপুস্তককে যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ্য বইয়ের কয়েকটা নির্বাচিত পাঠকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে এক বিস্তৃত কৃত্যালি মানচিত্র (Activity Map)। সংশ্লিষ্ট 'দিশা-পুস্তিকা'-তে কৃত্যালিগুলিকে উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। 'অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভ্স্' এক্ষেত্রে শিক্ষকমণ্ডলীর উপর ভরসা রেখেছেন। শিক্ষকগণ এই দিশা-পুস্তিকার সাহায্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজবোধ, পরিবেশ চেতনা ও মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তিতে নতুন নতুন আরও অনেক কৃত্যালি নির্মাণ করতে পারবেন এবং শিক্ষাদানও অনেক বেশি আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারবে। শিক্ষার্থীর পরিচিত আঞ্চলিক জ্ঞান ও বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই কৃত্যালিগুলি পাঠ্য বইয়ের পাঠখণ্ডগুলিকে আরও সহজবোধ্য এবং আন্তরিক করে তুলতে পারবে। শিক্ষকদের প্রচলিত পঠন-পাঠন ধারার মধ্যে অনুপ্রবেশ না করেও, এই কৃত্যালিগুলির দিশা শ্রেণিকক্ষের মধ্যে শিক্ষকদের কাজকে আরও সহজ ও কার্যকরী করে তুলতে পারবে বলে মনে করে অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভ্স্। এমনটা সম্ভব হলেই পুস্তকগুলির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

# চেনা ছকে অচেনা কথাঃ
# শিশু শেখে কীভাবে

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের নতুন পাঠক্রমে একটি বৃহত্তর শিক্ষণ ক্ষেত্রের Learning space-এর উল্লেখ রয়েছে। সেই ক্ষেত্রটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একজন শিক্ষার্থী। ক্ষেত্রটি নির্মাণ হয়েছে যে দশটি বিষয় নিয়ে তা হল;-

১) শিশু স্ব-শিখনের (অনুমান-অনুসন্ধান-পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আবিষ্কার) মাধ্যমে শিখবে।

২) সামাজিক প্রক্রিয়ায় শিশুদের জ্ঞান নির্মাণ (Knowledge construction) ঘটবে।

৩) শুধু পড়া বা লেখা নয়, নানা ধরনের মাধ্যম সহযোগে শিখন হবে সার্বিক ও বিস্তৃত।

৪) বাস্তব জীবন ও আঞ্চলিক জ্ঞান থেকে শিখন (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা) শুরু হবে এবং তা জীবনের ক্ষেত্রে 'প্রাসঙ্গিক' হয়ে উঠবে; অর্থাৎ বিদ্যাচর্চা থেকে পাওয়া, অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ মানুষের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

৫) শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের মূল্যবোধের শিক্ষা পাবে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণে তা ব্যবহার করতে পারবে।

৬) শিক্ষার্থীদের সমাজ, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতার বিকাশ ঘটবে।

৭) জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-ব্যতিক্রম নিরূপণ-বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ-সূত্র প্রণয়ন ও সৃজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিখন সম্পন্ন করতে পারবে।

৮) সৃজনমূলক শিক্ষা চর্চার ফলে শিশু মনের সুষম বিকাশ ঘটবে।

৯) শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে এবং তারা বৌদ্ধিক, সামাজিক, দৈহিক, ভাষিক, প্রাক্ষোভিক (Emotional), নান্দনিক (Aesthetic) ও ব্যক্তিগত দক্ষতা ও কৌশল অর্জন করতে পারবে।

১০) শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'ফলাফলের বৈষম্য' কমবে এবং সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারবে।

২০১১ সালে নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি চালু হওয়ার পর এই রাজ্যে শিখন মান কেমন হল, তা বুঝে উঠতে এখনও পর্যন্ত কোনও সমীক্ষা হয়নি। তবু গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেখা

যাচ্ছে আর সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেভাবে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে তাতে পরিস্থিতি যে ভাল নয়, তা স্পষ্ট। মিড- ডে মিলের মতো চালু ইনসেন্টিভ স্কীম এই ক্ষয়ের প্রবণতা রোধ করতে পারছে না। সম্প্রতি 'আসার'-এর রিপোর্টে শিশুদের পঠন মান ও গণিত বোধের মান সম্পর্কে এরাজ্যের যে চিত্র উঠে এসেছে, এককথায় তা মোটেও আশাপ্রদ নয়। অন্যদিকে, শিশুকে আগামী দিনের আত্মবিশ্বাসী, কর্মশীল ও মুক্ত মনের মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে শুধু মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর দিয়েই তা সম্ভব হবে না। এজন্য চাই শিশুর মধ্যে বিশ্ব-জাগতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং তার জন্য শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। সরকার ইতিমধ্যে বিদ্যালয় পরিকাঠামো সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষায় মিড-ডে মিল, সিলেবাসের আধুনিকীকরণ, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অর্থসাহায্য, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনক্রম বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার একটি গতিশীল ব্যবস্থা গড়ে তোলার কম চেষ্টা করছেন না। তবু কোথাও যেন একটা অভাব দেখা যাচ্ছে, যা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে বারেবারে বাধা দিচ্ছে।

আসলে বাস্তবে যা দেখা যাচ্ছে তা হল, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মতো সাধারণ গাণিতিক ধারণাও তেমনভাবে অনেকেই শিখতে পারছে না। তার উপর আবার এই গাণিতিক ধারণাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার সামর্থ্য অর্জনের বিষয়টি তো অনেক দূরের ব্যাপার। দুর্বল পঠন ক্ষমতার কারণে কোনও লিখিত পাঠ্যাংশের অর্থোদ্ধারে যেমন তারা অক্ষম, তেমনই জীবনে প্রয়োজনীয় কার্যকরী সাক্ষরতার লক্ষ্যও মোটেও পরিপূরণ হচ্ছে না। বিশ্ব-প্রকৃতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞানগুলি তাদের কাছে নিতান্তই ক্যুইজের উত্তরের মতো। কোনও সমস্যাকে অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের দৃষ্টিতে দেখার অভাবে তাদের মধ্যে সামগ্রিক পরিবেশবোধ গড়ে উঠছে না। কোনও সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ গড়ে তোলার সুযোগই তারা পায় না শ্রেণিকক্ষের মধ্যে। সবই তাদের কাছে তথ্যখণ্ড এবং স্মৃতিতে রাখার বিষয়। ফলে তারা না হোমে না যজ্ঞে। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন তাদের জীবনে যে তেমন কোনও গুণগত পরিবর্তন আনতে পারছে না, তা বোঝা যাচ্ছে ছোট ছোট সমীক্ষার ফলাফল থেকেই।

বিকল্পের সন্ধানে নেমে প্রথমেই শিশু কীভাবে শেখে তার সূত্রগুলি জেনে নেওয়া যাক। তার আগে জেনে নেওয়া যাক গুণগত মানের শিক্ষা কী?

## গুণগত মানের শিক্ষা বলতে এককথায় যা বোঝায় তা হলঃ

১) শিশুর যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা বৃদ্ধি

২) পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

৩) সামাজিক সম্পর্কগুলির সদর্থক চর্চা

৪) দেশপ্রেম ও দেশের নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

৫) আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা

৬) কার্যকরী সাক্ষরতা ও গাণিতিক ধারণা বৃদ্ধি

৭) হাত, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষার মান বৃদ্ধি

৮) বৃত্তিমূলক সামর্থ্য বিকাশ

৯) পর্যবেক্ষণ, উদ্ভাবন ও অনুশীলনের সামর্থ্য বৃদ্ধি

১০) শিশুর সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধের বিকাশ

১১) শিশুর সৃজনশীলতা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্বেগ থেকে উত্তরণের ক্ষমতা অর্জন

১২) সমাজে একজন সুস্থ 'মানুষ' হিসাবে গড়ে ওঠা

১৩) তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা ও তার যুক্তিসিদ্ধ ব্যবহার

এখন প্রশ্ন হল, প্রচলিত ব্যবস্থায় এই গুণগত মানের শিক্ষা পাওয়া যদি সহজ না হয়, তবে 'বিকল্প সন্ধান' করতে হবে চেনা ছকের বাইরে।

## শিশু যেভাবে শেখে তার সূত্রসন্ধানঃ (শিখনের আটটি সূত্র)

২০০৫ সালে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা নামে যুগান্তকারী দলিলটি পাঠ করলে এই সূত্রগুলির সন্ধান মেলেঃ

১) প্রাথমিক স্তরে প্রদান যোগ্য কোনও জ্ঞানই খণ্ড খণ্ডভাবে দেওয়া উচিত নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায় যে, কোনও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক খণ্ড খণ্ডভাবেই তৈরি। বিষয় বিভাজন খণ্ডীকৃত। ঘন্টা বাজিয়ে ক্লাসের সময়সীমাও নিয়ন্ত্রিত। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার ব্যবস্থা না হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকেও বহুমুখী করা যায় না। একসঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধারণাগুলি স্পষ্ট হয় না। তাই নির্দিষ্ট বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে শিশুর মধ্যে। এই পদ্ধতিকে বলে অনুবন্ধ প্রণালী (Principles of co-relation)। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শেখে অনেক তাড়াতাড়ি। যেমন ধরুনঃ

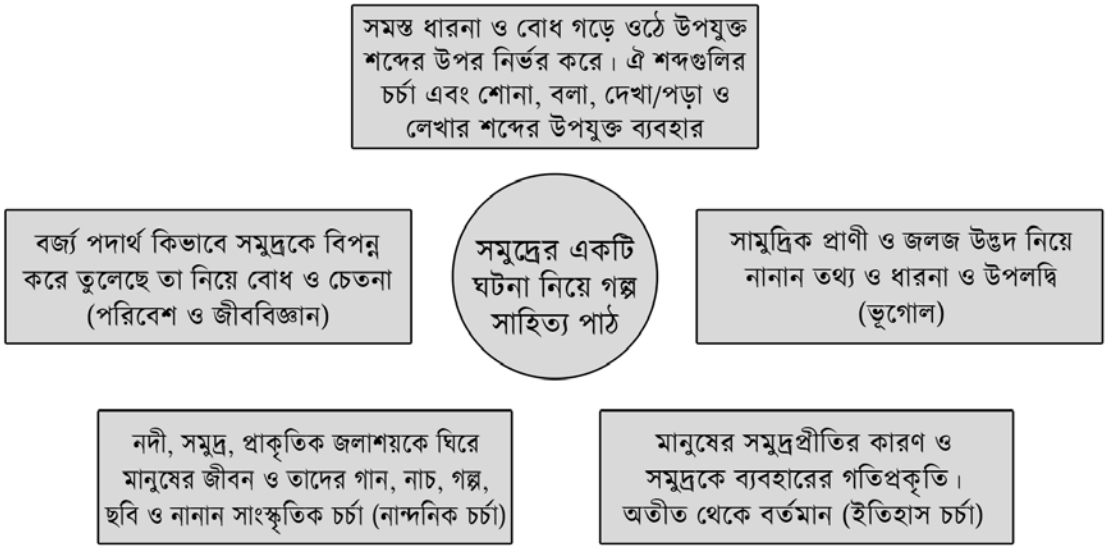


২) শিশু নিজে নিজে শেখে। বাবা, মা, শিক্ষক, আশেপাশের পরিবেশ ও এলাকার মানুষজন তাকে ছোট ছোট সাহায্য, ইঙ্গিত ও সূত্র ধরিয়ে দিতে পারেন। সচেতনভাবে এই প্রক্রিয়াটি ঘটলে শিশুর মধ্যে যে শিখন কাঠামো (Learning structure) ক্রমশ নির্মিত হয় সেখানে তার চারপাশে একটা ভারা বাঁধা (Scaffolding) শুরু হয়। একটা নির্মীয়মাণ বাড়ির চারপাশে যেমন ভারা বাঁধা হয় তেমনই। এটা শিশুকে দ্রুত শিখতে সাহায্য করে। একে বলে স্ব-শিখন ও ভারাবন্ধন পদ্ধতি (Self-learning and scaffolding Method)। এতে শিশু অনেক দ্রুত ও নির্ভুলভাবে শেখে।

৩) স্ব-শিখনের মাধ্যমে এই জ্ঞাননির্মাণ (Knowledge Construction) শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই হবে তা নয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বোধের সঙ্গে বহির্জগতের বাস্তবতাকে সম্পর্কযুক্ত করতে না পারলে এই নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যায়। বর্হিবিদ্যালয় শিখন একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া। এখানে পর্যবেক্ষণ, শোনা, বলাবলি এবং নিজের মতো করে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হয়। পরিচিত বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযোগস্থাপন হলে শিক্ষার্থী শেখে তাড়াতাড়ি।

৪) পারিবারিক ও গোষ্ঠী জীবন থেকে পাওয়া জ্ঞান, সামর্থ্য ও কর্মকৌশল মানুষকে দ্রুত কর্মক্ষম করে তোলে।[অতীতকালে

নিরক্ষর স্থপতি, শিল্পী ও কারিগররা যে অনুপম স্থাপত্য ও শিল্প তৈরি করে গেছেন, তা আজ উচ্চশিক্ষার অন্দরে স্থাপত্যবিদ্যার পাঠ্য] বিদ্যালয় শিক্ষায় এই জ্ঞানের গুরুত্ব কম নয়। যত বেশি এই আঞ্চলিক জ্ঞান ও সামর্থ্যকে পাঠ্যসূচির প্রাসঙ্গিক চর্চায় কাজে লাগানো যাবে, ততই শিক্ষার্থী দ্রুত ও নিখুঁতভাবে তা শিখতে পারবে।

৫) যে কোনও জ্ঞান ও বোধ সম্পর্কে শিশুর মধ্যে একটি অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তুলতে পারলে বাকি কাজগুলি সহজ হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে যাওয়া একটা ভুল পদক্ষেপ। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে নানান রকমের কাজ করানোই বাঞ্ছনীয়; যেমন বেশ কিছু সৃজনমূলক কাজ, হাতের কাজ, গল্প শোনা-বলা, অভিনয় করা, দৃশ্য-শ্রাব্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা ও আলোচনা করা, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা বা বর্হিবিদ্যালয়ের বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা করা। একে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insightful Learning) বলে। এই পদ্ধতিতে শিশুর শিখন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে।

৬) শিশু কল্পনা করতে ভালবাসে; সেই সঙ্গে ওই কল্পনাকে বিভিন্নভাবে বাস্তবে রূপদান করতেও ভালবাসে। এটা ঘটে তার কারণ, শিশু স্বভাবে অনুকরণপ্রিয়। তাই প্রতিটি জ্ঞান ও বোধ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় শিশুর কল্পনা শক্তি ও তা পুনঃসৃজন (Re-cration) করার ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে সুযোগ দিতে হবে। নাটক, গান, গল্প বলা, ছবি আঁকা, চরিত্রাভিনয়, খেলাধূলা, হাতের কাজ, পরিকল্পনা তৈরির মতো বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী চেনা বাস্তবের পুনঃসৃজন করতে পারে। এগুলি সে যতই করবে, ততই তার বোধ ও মেধা উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় যা এক দারুণ উপযোগী পদ্ধতি।

৭) শিশু দলগতভাবে শিখতে পারে তাড়াতাড়ি। যে কোনও জ্ঞান বা বোধের চর্চা প্রথমে দলগতভাবে হওয়া উচিত; পরবর্তীতে তা শিশুর ব্যক্তিগত ধারণা বা বোধের জায়গায় স্থান পেল কিনা তা নজর করতে হবে। শিশু ব্যর্থ হলে তাকে পুনরায় উপযুক্ত ইঙ্গিত ও সূত্র প্রদান (Scaffolding) করে ওই স্তরে নিয়ে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিকে শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে-উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সামাজিক জ্ঞান নির্মাণ (Socially Constructed Knowledge) পদ্ধতি। একটি নিরক্ষর মানুষও সামাজিক প্রক্রিয়ায় যেভাবে জীবনযাপন করতে শেখে, সেই একই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ বিদ্যালয় শিক্ষার অন্দরেও ব্যাপকভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

৮) শব্দ শোনা, শব্দের অর্থ বোঝা, শব্দ আদান-প্রদান করা, শব্দ শুনে বুঝতে পারা, শব্দের মাধ্যমে চিন্তা করতে পারা এবং শব্দ ব্যবহারে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা শিশুর গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। পর্যবেক্ষণ করতে গেলেও লাগে শব্দ। ধরুন, তৃতীয় শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী ভুল করে আম গাছের হলুদ হয়ে যাওয়া পাতাকে 'পাকা আম' ভাবল। পর্যবেক্ষণের পর তার ভুল ভাঙল। এই সমগ্র ঘটনাটিতে দুটি শব্দ তার মনকে বারবার নাড়া দিয়েছে-'হলুদ পাতা' ও 'পাকা আম'। এই দুটি শব্দই তার জানা না থাকলে তার পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হত না। আসলে কিছু চিন্তা করতে গেলে বা কাজ করতে গেলে আমাদের মাথায় কয়েকটি 'শব্দ' ও শব্দ থেকে জাত কিছু ছবি মস্তিষ্কে প্রথম নাড়া দেয়। এই শব্দ দিয়েই আমরা শুনি, বলি ও প্রকাশ করি। যে কোনও কনসেপ্ট বা পাঠখণ্ডকে নিয়ে শব্দচর্চার মাধ্যমে এগোলে তা শিশু স্থায়ীভাবে শিখতে পারে। এরজন্য মানস মানচিত্র (Mind mpping) পদ্ধতি অবলম্বন করলে খুব তাড়াতাড়ি শিশু পাঠের বিষয়বস্তু আয়ত্বে আনতে পারে। মানস মানচিত্র নির্মাণের মাধ্যমে শব্দজাল গঠন শিশু শিখনের একটি উপযোগী সূত্র। পাখিদেরও নিজস্ব স্বর বা কাকলি আছে। নিজেদের জৈবিক ও সামাজিক প্রয়োজন একে অপরকে বোঝাতে তারা ওইসব শব্দ কাজে লাগায়। মানব সমাজের প্রতিটি চিন্তন, কথোপকথন, বোধ ও পর্যবেক্ষণের জন্য লাগে উপযুক্ত শব্দ। মানুষের মুখের শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বেরিয়ে আসার আগে মস্তিষ্কে একটা ঘটনা ঘটে। মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নিউরন। এই নিউরনগুলি হল মস্তিষ্কের ভাষা বা শব্দ। একটি নিউরনের সঙ্গে অন্য নিউরনের সংযোগ ঘটলে একটা ঝলকানি (Flashing) হয় এবং পরিণামে মস্তিষ্কের মধ্যে একটা অর্থ তৈরি হয়। এক একটা ঝলকানির সঙ্গে মুখের শব্দের ঘনিষ্ট সংযোগ থাকে বলেই আমরা কথা বলতে পারি। এইরকম এক একটা ঝলকানির ফলশ্রুতিতে শিশুটির মনে হয়েছিল 'গাছে একটা পাকা আম' আছে। পরে সে ভাল করে অনুসন্ধান করে এবং সাদৃশ্য ও পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা প্রয়োগ

করে। তখনও একইভাবে সংশ্লিষ্ট নিউরনে নিউরনে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং অর্থপূর্ণ ঝলকানি হয়। এবার সে আবিষ্কার করে যে সে ভুল করেছে। তখনই তার মুখ দিয়ে সংশ্লিষ্ট শব্দ বেরিয়ে আসে, 'ওটা পাকা আম নয়, মরা হলুদ পাতা'। আমরা যা কিছু অনুভব করি, ইচ্ছা করি, চিন্তা করি, পর্যবেক্ষণ করি, সবখানেই 'শব্দ' অনুঘটকের কাজ করে। আমরা 'শব্দ' দিয়ে ভাবি আবার 'শব্দ' ব্যবহার করে ভাবনা প্রকাশ করি। তাই পরিস্থিতি অনুসারে 'শব্দের উপযুক্ত চর্চা' সামগ্রিকভাবে শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। উপযুক্ত শব্দ সহযোগে কথা শোনা, কথা বলা, অর্থপূর্ণভাবে পড়া, বুঝিয়ে বা গুছিয়ে লেখার মধ্যে দিয়ে এই শব্দচর্চা ঘটে। এমনকি নাটক অভিনয়, চরিত্র অভিনয়, সংগীত, তর্ক-বিতর্ক, মানুষের সাথে কথোপকথন, সমীক্ষাপত্র পাঠ, সমীক্ষাপত্রে দু-এক কথায় লেখা, পারস্পরিক আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমেও এই চর্চা শক্তিশালী হয়। একে বলে 'শব্দ জাল ও শব্দ ভান্ডার নির্মাণ' (Word semantics and lexical treasure development) পদ্ধতি । যেমন ধরুন, 'রান্নাঘর' বললেই একটি তৃতীয় শ্রেণির শিশুর ক্ষেত্রে কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ মনে পড়ে। যেমন 'থালা,' 'বাটি,' 'ঘটি,' 'হাতা,' 'উনুন,' 'বাসন-কোসন,' 'বেসিন,' 'সাবান,' 'দেশলাই,' 'লাইটার,' 'পাত্র,' 'নুন,' 'তেল,' 'ঝালমশলা' ইত্যাদি অনেক কিছু। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে শব্দের উপযুক্ততা নিয়ে তার বোধ বাড়ে। মান্য ভাষার প্রভাব তার উপর ক্রিয়াশীল হয় এবং সংশ্লিষ্ট বস্তু বা ভাবনার বৈচিত্র্য মাথায় রেখে শিশুর শব্দ চর্চার মানও বাড়ে। এই শব্দ চর্চার মান যত বাড়ে শিক্ষার্থীর মেধা ও বুদ্ধির প্রকাশ ততই পরিলক্ষিত হয়। শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে হোক বা বাহিরে সর্বক্ষেত্রেই শব্দচর্চার মান শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক জ্ঞান ও সামাজিক মূল্যবোধকে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলতে সক্ষম হয়। পুরুলিয়া, বাকুড়া, বীরভূমের মতো জেলাগুলিতে এই চর্চার মান যত বাড়ানো হবে ততই শিশু শিখবে বেশি। এটি শ্রেণিকক্ষে প্রথাগত সাক্ষরতা ও পাঠ্য বইয়ের চর্চা নয়, বরং এটি একটি জীবনশৈলী (Life skill) যার মান উন্নত না হলে একটি শিশু ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারে না। তাই এই পদ্ধতি অবহেলা করে শিশুর কোনও শিক্ষা সফল হতে পারে না।

# চেনা ছকে অচেনা কথাঃ
# প্রাসঙ্গিক শিক্ষা

## লুপ্তপ্রায় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার তত্ত্বতালাশ

## [চারটি সূত্র]

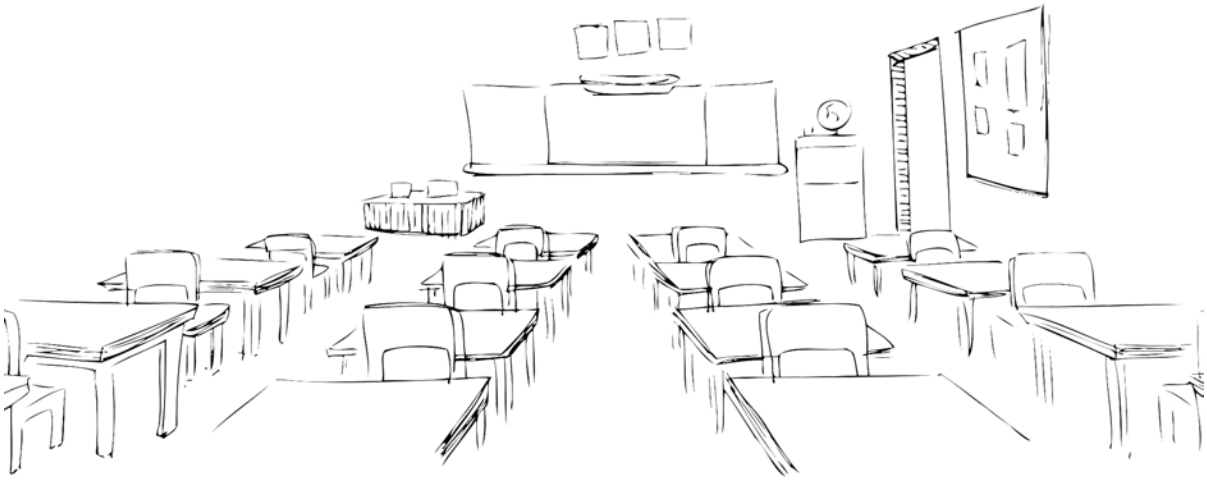

একথা ঠিক, অতীত দিনের আন্তরিক শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান এযুগে ক্রমশ যান্ত্রিক গণশিক্ষায় পরিণত হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষগুলি হয়ে উঠেছে গতানুগতিক, পরীক্ষা নির্ভর, শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত ও যোগান সর্বস্ব। যুক্তিনির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিবর্তে নানান তথ্য, নাম ও সূত্রের গলাধঃকরণ আর গণিতের যান্ত্রিক চর্চা, দক্ষতা ও সামর্থ্য অর্জনের পরিবর্তে শংসাপত্রে সেরার সেরা নম্বরের জন্য মরিয়া চেষ্টা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তে স্বার্থপরতা ও অসম প্রতিযোগিতা আর আধুনিক মনন সমৃদ্ধ পরিণত মানুষ তৈরির পরিবর্তে একটি খণ্ডিত অর্ধশিক্ষিত যন্ত্রমানবে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে সামাজিক বোধ বিলুপ্ত হচ্ছে, পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে, সহিষ্ণুতার অভাব দেখা যাচ্ছে এবং যুক্তিসঙ্গত মুক্ত মনের চিন্তায় দেখা যাচ্ছে দৈন্যতা। সীমাহীন লোভের শিকার হচ্ছে সমাজ, আর জীবনযাপনে, কর্মে, বিশ্বাসে দেখা যাচ্ছে নিষ্ঠার অভাব। এমনটা অবশ্য দেশজুড়ে এক জাতীয় অবক্ষয়ের সময়। তবু এই দুঃসময়ে প্রচলিত ধারার অভিমুখ বদল করে ফেলা যায় তখনই, যদি শিক্ষায় গোড়া থেকেই জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করা যায়। এখানেই এযুগের শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং তাঁদের ভূমিকাও দ্রুত পরিবর্তিত হতে চলেছে।

এন.সি.এফ. (NCF) ২০০৫-এ যতই সুপারিশ থাকুক, গত পনেরো বছরে শ্রেণিকক্ষ এখনও পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক (Contexul) ও স্থানিক (Place-based) হয়ে উঠতে পারেনি। কোনও শ্রেণিকক্ষকে শিশুর জীবনে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হলে পাঠ্যসূচিকে শিশুর জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। গত কয়েক বছরে পাঠ্যসূচির অধিকাংশই শিশুর জীবনের অনুসারী হলেও বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে তার কোনও ছাপ পড়ছে না। ফলে পঠন-পাঠনের উপযোগিতাও চোখে পড়ছে না। এখানে একটাই পথ; তা হল পঠন-পাঠনকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা। সেটা করতে গেলে নীচের কয়েকটি দিক নজর রাখতে হবেঃ

## ১) পাঠের অভ্যন্তরে নিহিত বার্তার অনুসন্ধান ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষাঃ

যে কোনও পাঠের অভ্যন্তরে কতকগুলি বার্তা রয়েছে। সেগুলি কিছুটা শিশুর সামর্থ্য নির্মাণ সংক্রান্ত, কিছুটা তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ নিয়ে, আবার কিছুটা সামাজিক কর্তব্য-দায়িত্ব ও আদর্শ ভাবনা সংক্রান্ত। এগুলিই ওই পাঠটির আসল কথা। এই আসল কথাগুলি চিহ্নিত করা খুব জরুরি। ধরুন, তৃতীয় শ্রেণিতে 'ফুল' নামে একটি রূপকথা-ভিত্তিক গল্প আছে। ওখানে তিনটি 'মৌলিক বার্তা ও মূল্যবোধ' চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ক) শিশুর কল্পরাজ্যের চরিত্রকে কল্পনা করতে পারা হল শিশুর জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। এই কল্পনার ক্ষমতা থেকেই মানুষ ভবিষ্যৎকে বুঝতে পারে এবং সেইমতো আগে থেকে পরিকল্পনা করতে পারে। শুধু চিত্রকর বা ভাস্কর কল্পনাপ্রবণ মানুষ নয়, বৈজ্ঞানিকরাও আদতে কল্পনাপ্রবণ মানুষ যারা কল্পনাশক্তিকে যুক্তিপূর্ন সমাধান সূত্রে পরিণত করতে পেরেছেন। অন্যদিকে একজন চিত্রকর বৈজ্ঞানিক না হয়েও এমন ছবি আঁকতে পারেন, যা আগামী দিনে বৈজ্ঞানিককে নতুন আবিষ্কারের সূত্র দান করতে পারে। তাই শিশুর মধ্যে কল্পনাশক্তি বাড়িয়ে তুলতে তাকে দিতে হবে নানান কৃত্যালি আর কাজের স্বাধীনতা। শুধু 'ফুল' গল্পটা পড়িয়ে প্রশ্নোত্তর করালে এই ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটবে না। তাই শিশুর নান্দনিক এবং কল্পনাকামী শিল্পী মন নিয়ে চাই নানান কৃত্যালি।

খ) 'বীজ থেকে ফুল ও ফল' এই বিষয়টি শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়। কিন্তু বিদ্যালয়ে সেভাবে এর চর্চা হয় না। এতে শিশুর মধ্যে গাছ-গাছড়ার প্রতি ভালবাসা ও ব্যক্তিগত মমত্ববোধ গড়ে ওঠে। তাছাড়া এখানে শিক্ষার্থী প্রাকৃতিক রহস্যকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়। নাটক, গান, বাগান তৈরির মধ্যে দিয়েই তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধের বিকাশ হয়।

গ) 'প্রকৃতির রং এবং প্রকৃতি থেকে রং' এই ভাবনাটিও এই গল্পের একটি শক্তিশালী বার্তা। এখানে শিক্ষার্থীরা একটা সত্য আবিষ্কার করতে পারে, যে প্রকৃতিই আসলে সব রঙের মালিক। যে কোনও শিশুই প্রাকৃতিক দ্রব্য মিশিয়ে নানান রঙ বানাতে পারে। ছবি আঁকা বা রং তৈরির মতো কৃত্যালি এখানে খুব উপযোগী।

এইভাবে মূল বার্তাগুলি চিহ্নিত করার পর সেগুলি নিয়ে শিশুর জানার ইচ্ছা, ভাল লাগার বিষয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, যুক্তিপরম্পরায় চিন্তা করার ক্ষমতা, মান্য ভাষায় কথা বলা বা শুনে বোঝার মতো নানান ক্ষমতার চর্চা হতে পারে। পাঠ্য বইয়ের প্রথাগত চর্চার পূর্বে এভাবেই পাঠ্য বিষয়ের বার্তাগুলিকে শিশুর জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হবে। এটি প্রাসঙ্গিক শিক্ষার একটি পূর্বশর্ত ।

## ২) বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোজন ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষাঃ

শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক করতে হলে পাঠ পরিবেশনার কৌশল বদলে ফেলতে হবে। শিক্ষকের কর্তব্য হল প্রতিটি বিষয়কে শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করা। প্রতিটি শিশুর কিছু-না-কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সেগুলি গড়ে ওঠে শিশুর পারিবারিক এবং আঞ্চলিক জ্ঞান ও আশেপাশের পরিবেশ থেকে। সে পরিবার ও সমাজের অনেককেই চেনে; তাদের আচরণ সম্পর্কেও তার অভিজ্ঞতা থাকে। প্রকৃতি ও পরিবেশের অনেক কিছু ধারণা ওর স্পষ্ট। বিদ্যালয় না গিয়েই এই জ্ঞান লাভ করেছে সে। এটাই মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান বিকাশ। একজন নিরক্ষর মানুষের মধ্যেও এইরকম নানান জ্ঞান গড়ে ওঠে পরিবেশ ও সমাজ থেকে। ফলে স্বাভাবিক জ্ঞান চর্চার ধারায় শিশু অন্যের নির্দেশ ছাড়াই তার নিজস্ব কৌতূহল, জানার ইচ্ছা, অঙ্গ সঞ্চালনের স্বাভাবিক প্রবণতা, নিজস্ব বোধ ও বুদ্ধির ব্যবহার করেই অনেক জ্ঞান লাভ করে। সেখানে যে যে প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে অবলম্বন করে তা হলঃ

- সবকিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।
- লোকজ ও সৃজনমূলক কাজে আকর্ষণ বোধ করা।।
- শুনতে শুনতে আর বলতে বলতে কথা বলা শেখা ও কথা শুনে বোঝা।
- একসঙ্গে চোখে দেখে আর কানে শুনে কোনও বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা।

- কোনও কিছু শুনে তার ভেতরের বার্তাটি আন্দাজ করতে পারা।
- হাতে-নাতে কাজ করে তাড়াতাড়ি বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা; ইত্যাদি।

পাঠ পরিচালনার সময় শিক্ষককে শিশুর এই আজন্ম লালিত স্বাভাবিক দক্ষতার উপর নির্ভরতা রাখতেই হবে। তাহলেই পাঠটি শিশুর প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক শিক্ষায় পরিণত হবে। এরফলে পাঠ্য বইয়ের কোনও পাঠ যেমন প্রাসঙ্গিকভাবে গুরুত্ব পায়, তেমনই আঞ্চলিক জ্ঞানের গভীরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সমস্যার মূল সূত্র শিশুরা সহজেই আবিষ্কার করতে পারে এবং তাকে বৃহত্তর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। যেমন তৃতীয় শ্রেণির 'ফুল' গল্পটিতে যেখানে 'পরি' নিয়ে চর্চা আছে, সেখানে শিক্ষক যদি শিশুকে মজা করে রূপকথার গল্প শোনান বা দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিতে কোনও কল্পরাজ্যের চরিত্রের কাহিনী দেখান, তবে শিশুরা তা 'হাঁ' করে দেখে এবং শোনে। এবার শিক্ষক যদি বলেন, "যেমন খুশি কল্পনা করে কাল সবাই রূপকথার ঘটনা বানিয়ে নিয়ে আসবে। কাল এনিয়ে একটা মজার আসর বসবে", তবে শিক্ষার্থীরা সামাজিক সূত্রে পাওয়া নানান রূপকথার কাহিনী ভেবে নিয়ে নিজেরাই নতুন নতুন গল্প বানাতে পারে। এভাবেই চাঁদের বুড়ির চরকা কাটার রূপকথা থেকেই মানুষের চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। কল্পনা থেকে শুরু হয় বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এটাই হল নিজস্ব ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঠে আলোচ্য ভাবনার প্রাসঙ্গিক সংযোগসাধন। এইভাবে শিশু পারিবারিক ও সামাজিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে শ্রেণিকক্ষে টেনে আনতে পারে। একইভাবে 'বীজ থেকে ফুল ও ফল' পর্বে শিক্ষক শিশুদের হাতে-নাতে কাজ করিয়ে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি ঘটাতে পারেন; এই অভিজ্ঞতার বেশিরভাগই শিশুরা তাদের পরিবার ও সমাজ থেকে আহরণ করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ব্যবহার করতে পারে। অনুরূপভাবে, শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে এই বিষয় নিয়ে গান, ছড়া, নাটকের মতো নানা লোকজ মাধ্যমের ব্যবহারও করা যায় আর 'মানস মানচিত্র' চর্চার মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতায় থাকা নানান বস্তু, ঘটনা, ক্রিয়ার সঙ্গে উপযুক্ত সংশ্লিষ্ট শব্দজালকে সংযুক্ত করা যায়। অন্যক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের বাইরে পঞ্চায়েত, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্কের মতো এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখে সেখান থেকে সম্ভব হলে নমুনা সংগ্রহ করে আনতে পারে শিশুরা। এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিজ্ঞতা শোনার সুযোগ পেলে শিশুর স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞান আরও পরিশীলিত হয়ে ওঠে। ফলে সংশ্লিষ্ট পাঠের বার্তাটিও আরও অর্থপূর্ণ হয়ে যায়। বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা থেকে সে যে সূত্রটি নিজেই আবিষ্কার করে তাকে সে সহজে সংশ্লিষ্ট পাঠের উন্নততর জ্ঞান ও বোধের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে। এমনটা হলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা স্থানীয় বাস্তব জগতের সঙ্গে অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায় এবং শিশুও বাস্তববোধ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিষয়টিকে অনুধাবন করতে আরামবোধ করে। এখানেই শিক্ষা হয়ে ওঠে প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক।

## ৩) শিশুর আনন্দবোধ ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষাঃ

শিক্ষাকে স্থানিক ও প্রাসঙ্গিক করতে হলে যে কৃত্যালিই গ্রহণ করা হোক না কেন তা হতে হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, আনন্দদায়ক এবং আকর্ষণীয়। আর তা করতে গেলে শিশু কীসে আনন্দ পায় তা বুঝতে হবেঃ

ক) যেখানে স্বাধীনতা সেখানেই আনন্দ ।

খ) যেখানে একটু জানা কিন্তু অনেকটা অজানা সেখানে ওই রহস্যের রেখা ভেদ করতে আনন্দ।

গ) মজা করে হাতে-নাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আনন্দ।

ঘ) শিশুর চেনা জগৎ অর্থাৎ চেনা ঘটনা, চেনা পরিবেশ, চেনা ভাষা ও কথা, চেনা লোকজ সংস্কৃতি, চেনা মানুষ ও তাদের মতামত বা অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পেলে শিশুর মনে আরামবোধ হয় ও আনন্দবোধ আসে।

ঙ) মজাদার প্রতিযোগিতায় থাকে আনন্দ।

চ) একই সাথে চোখে দেখে এবং কানে শুনে কিছু বুঝতে আনন্দ।

ছ) সৃজনমূলক কৃত্যালির মাধ্যমে কোনও কিছু করতে ও জানতে আনন্দ।

জ) নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপকরণের মুখোমুখি হতে আনন্দ।

ঝ) ভুলের ভয় না থাকলেই আনন্দ।

ঞ) শিক্ষকরা কাছের বন্ধুর মতো হয়ে পাশে থাকলে আনন্দ।

উপরের দশটি শর্ত বাদ দিলে কোনও পাঠই শিশুর জীবনে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে না।

## ৪) স্থানীয় সামাজিক জনগোষ্ঠী ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষাঃ

বিদ্যালয়ের বিকাশ কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ হতে পারে না। বিদ্যালয় নিজেই একটি মিনি সমাজ। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সঙ্গে স্থানীয় এলাকার মানুষ, পঞ্চায়েতের সদস্য, আশাকর্মী, সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণকারী সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠনের কর্মী সবারই এই উদ্যোগে নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে। যা মনে রেখেই শিক্ষায় প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। বিদ্যালয় কৃত্যালির সঙ্গে 'স্থানীয় সামাজিক জনগোষ্ঠী' (Community)-কে যুক্ত করতে না পারলে শিশুর শিক্ষা প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক হয়ে উঠবে না। তাই পাঠগুলির মধ্যে কোথায় কোথায় এই কমিউনিটিকে যুক্ত করার সুযোগ আছে তা খুঁজে বের করতে হবে। ধরুন, কোনও মানুষ যিনি ভাল গল্প বলতে পারেন, লোকগান করতে পারেন, নানান হাতের কাজ করে তার সংসার নির্বাহ করেন, যিনি চাষবাসের কাজে দারুন দক্ষ, ফুলের চাষে বিশেষজ্ঞ, পঞ্চায়েতে কাজ করেন, সরকারি বা আধা-সরকারি গণসেবী হিসাবে কাজ করেন বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চালান আবার পাহাড়ে চড়া, যুদ্ধে যাওয়া, আপৎকালীন কাজে অংশগ্রহণ করা, মানুষের আপদ-বিপদে পাশে দাঁড়ানোয় যাঁর অভিজ্ঞতা আছে এমন মানুষকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কৃত্যালির সঙ্গে যুক্ত করাই যায়। কখনও তাঁদের কাছে গিয়ে আবার কখনও তাঁদেরকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে এই সংযোগ রক্ষা করা যায়। এই প্রক্রিয়া যতই নিয়মিতভাবে ঘটবে ততই শিশুর পাঠ ক্রমশ সহজ ও ঘরোয়া (Homely) হয়ে উঠবে। এটি শিশুর অনুধাবনের মাত্রাকে অনেক শক্তিশালী ও জোরদার করতে পারবে। তখন শিশুর শিক্ষা হয়ে উঠবে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

# চেনা ছকে অচেনা কথা

# ভাবনাটিকে রূপদান করতে উদ্যোগ

## [চারটি ক্ষেত্র]

কাঙ্খিত উদ্যোগের মূল ক্ষেত্র হল, এই যে ৮ থেকে ১৪ বছরের শিশুরা প্রথাগত পঠন-পাঠনের বাইরে তাদের জীবন ও জগৎ নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক কৃত্যালি এবং তাদের কাঙ্খিত সামর্থ্য ও মূল্যবোধের চর্চা করবে। পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট পাঠটি শুরু করার আগে কয়েকদিন ধরে। শিক্ষক এই চর্চা করিয়ে নেবেন। মৌলিক সামর্থ্য ও মূল্যবোধের কথা মাথায় রেখে উদাহরণস্বরূপ বেশ কিছু কৃত্যালি উল্লেখ করে শ্রেণিভিত্তিক কৃত্যালির দিশা-পুস্তিকা নামে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য তিনটি পৃথক পুস্তিকা রচিত হয়েছে পরবর্তী খণ্ডগুলিতে। ওই পুস্তিকাগুলির সাহায্য নিয়ে শ্রেণি শিক্ষকগণ আরও অনেক ধরনের কৃত্যালি নির্মাণ করতে পারবেন। বর্তমান দিশা-পুস্তিকায় সামগ্রিকভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা দেওয়া হয়েছে। বাকি তিনটি শ্রেণিভিত্তিক দিশা-পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কৃত্যালি। এই পুস্তিকাগুলিতে তৃতীয় শ্রেণির জন্য নেওয়া হয়েছে 'পাতাবাহার' থেকে নয় (৯)টি গল্প/কবিতা এবং আমাদের পরিবেশ থেকে দুই (২) টি অধ্যায়। চতুর্থ শ্রেণির জন্য 'পাতাবাহার' থেকে আটটি (৮) পাঠ এবং 'আমাদের পরিবেশ' থেকে ছটি (৬) অধ্যায় এবং পঞ্চম শ্রেণিতে 'পাতাবাহার' থেকে সাতটি (৭) পাঠ এবং 'আমাদের পরিবেশ' থেকে পাচটি (৫) অধ্যায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি পাঠকে এক বা একাধিক উপভাবমূলে (Sub-theme) বিভাজিত করা হয়েছে যাতে পাঠটির মধ্যে নিহিত শিক্ষণীয় মৌলিক বার্তা, ভাবনা ও মূল্যবোধগুলি চিহ্নিত হতে পারে। শিশুর শিক্ষণীয় এই বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করার দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকার। এরপর তিনি প্রতিটি উপভাবমূলের মধ্যে কী কী ধরনের স্থানীয় উপাদানের ব্যবহার করা যাবে তারও একটি তালিকা তৈরি করবেন। একে বলা যেতে পারে শিখন প্রযুক্তিতে স্থানীয় উপাদানের ব্যবহার (Use of local element in Learning engineering)। এটি হতে পারে স্থানীয় ভাষা, এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ, স্থানীয় সমস্যা, স্থানীয় সমাজের মানুষজন, উৎসব, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক চরিত্র, এলাকার বাজার-হাট, মিলনমেলা, এলাকার প্রতি গর্ববোধ, স্থানীয় লোকশিল্প ও হস্তশিল্প ও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, স্থানীয় চিরাচরিত জ্ঞান, প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। যে কোনও পাঠ শুরু করার আগে ক্ষেত্র প্রস্তুতি হিসাবে এই স্থানিক উপাদানের যথাযোগ্য ব্যবহার করা চাই। তাই এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি উপভাবমূলেই চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যেতে পারে। এখন দেখে নেওয়া যাক ওই চারটি ক্ষেত্র কী কী হতে পারেঃ

### উপভাবমূলের চারটি ক্ষেত্রঃ

১) শিশুর মস্তিষ্কে 'শব্দজাল ও ভাষভান্ডার' নির্মাণ এবং তা করতে নানান লিখিত মাধ্যমের ব্যবহারঃ সংশ্লিষ্ট উপভাবমূল অনুযায়ী বিস্তৃত 'শব্দজাল' তৈরি করতে হবে এবং এই শব্দভাণ্ডারে থাকবে কথ্য ভাষাসহ মান্য ভাষার শব্দ ও শব্দগুচ্ছ। এগুলির চর্চা ও প্রয়োগ করতে করতে কাঙ্খিত মানের শ্রবণ, কথন, পঠন, পর্যবেক্ষণ, চিন্তন ও অনুধাবন সামর্থ্য গড়ে উঠবে। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় কথ্য ভাষা থেকে মান্য ভাষায় উত্তোরণই লক্ষ্য হবে সকলের।

২) পাঠের অভ্যন্তরে নিহিত শিশুর কাছে নতুন বার্তা ও ভাবনাগুলিকে শিশুর নিজের পরিবার, চেনা বাস্তব জগৎ ও পরিবেশের সঙ্গে মিশিয়ে পর্যবেক্ষণ করানোর ব্যবস্থা করা। এখানে শিক্ষককে নানান বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি নির্মাণ করতে হবে। এরজন্য শিক্ষকদের পরিকল্পিত সমীক্ষাপত্র নির্মাণ, বিবরণ পেশের চর্চা এবং বাস্তব থেকে নিদর্শন সংগ্রহ করে আনার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর তার সাথে চাই কাজ চালানোর মতো ন্যূনতম দু-চারটি শব্দ পড়া ও লেখার ক্ষমতা।

৩) সৃজনশীল কৃত্যালি ও লোকজ মাধ্যমের ব্যবহারঃ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। প্রতিটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে শিক্ষককেই খুঁজে বের করতে হবে কোথায় কোথায় কী কী ধরনের সৃজনশীল কাজে শিশুকে যুক্ত করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বোধ তৈরি করতে সাহায্য করা যায়। নাটক, গান, চরিত্রাভিনয়, পুতুল তৈরি, ছবি আঁকা,

মাটির কাজ, ছড়া তৈরি, গল্প বলা, গল্প শোনা, তর্ক-বিতর্ক করা, রঙ করা, বাগান সাজানো ইত্যাদির মতো নানা কৃত্যালি। যা ওই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় তা পরিকল্পনা ও নির্মাণ করা শিক্ষকদেরই কাজ। শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে যে কোনও অনুষ্ঠানকে নিজেদের মতো করে উপস্থাপনা করতে পারে। তাই এই কাজের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে একটি 'সামগ্রী ভান্ডার'(T.L.M Bank) তৈরি করতে হবে। একই সাথে ছবি ও গল্পের গ্রন্থাগার এবং শিক্ষার্থীদের কাজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকল্পভিত্তিক হাতে-নাতে কাজের দ্রব্য ও সরঞ্জামগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে শ্রেণিকক্ষের মধ্যে।

৪) দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমকে ব্যবহার করে শিশুর জ্ঞান, বোধ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দক্ষতাকে আরও উন্নত করে তোলাঃ এখানে আগে থেকে তৈরি রাখতে হবে অডিও-ভিস্যুয়াল ক্লীপগুলি। এগুলি শিশুকে তার স্থানিক অভিজ্ঞতার ভিত্তি থেকে বৃহত্তর ধারণার জগতে স্থাপন করতে পারবে। অন্যদিকে যা শিশুর একেবারেই দৃষ্টিগোচর নয়, তাও পরোক্ষ প্রত্যক্ষণ করাতে পারবে।

এবার উপরের চারটি ক্ষেত্র দিয়ে বিষয়গুলি স্পষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করিঃ

## ১) শব্দজাল ও শব্দ ভাণ্ডার নির্মাণ ও নানান লিখিত মাধ্যমের ব্যবহার

ইতিমধ্যে শিশু কীভাবে শেখে এটি বলতে গিয়ে এই বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে। মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য শিশুর জীবনে প্রথম সাত-আট বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে মস্তিষ্কের সম্মুখ কক্ষ (Frontal head) পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায়। ওই কক্ষের বামদিকের অংশটি দিয়ে একটি শিশু যখন যুক্তি বিচার, প্যাটার্ণ আবিষ্কার, সূত্র নির্মাণ, হাতে-নাতে কাজ করতে পারার কৌশল ও গাণিতিক বুদ্ধির পরিচালনা করতে পারে এবং সাথে সাথে বাম জানলা দিয়ে যাবতীয় জাগতিক ঘটনা, বাস্তবতা, আর জটিল স্বার্থচিন্তা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে পারে; তখন ডান দিকের অংশে চলে সৃজনমুখী বোধের বিকাশ, পারস্পারিক সম্পর্ক রক্ষার কৌশল, আর নানান নান্দনিক ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ এবং সেইসঙ্গে ডান জানালা দিয়ে এই ধরনের যাবতীয় জাগতিক উপাদানের তত্ত্ব, অভিজ্ঞতা ও চর্চার আগ্রহ ঢুকে পড়ে মস্তিষ্কে।

এইভাবে মস্তিষ্কের ডান ও বাম অংশ পরিস্ফুট হতে থাকে অন্তত এগারো/বারো বছর বয়স পর্যন্ত। দুটি অংশের মধ্যে আবার একটি যোগসূত্র আছে যার মাধ্যমে শিশু এক অংশের উপাদান নিয়ে অন্য অংশে নিশ্চিন্তে পরিপাক করতে পারে। শিশুর বংশগতি (Heredity) ও পরিবেশ (Environment) অনুসারে এই পরিপাকের বিশেষত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর এই সমস্ত অপারেশনের জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করে হাজার হাজার শব্দ ও শব্দগুচ্ছ। মনুষ্যেতর প্রাণীর তেমন কোনও স্মৃতি নেই, তার কারণ তাদের মস্তিষ্কে শব্দভাণ্ডার নির্মাণের কোনও পরিসর নেই। স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে কোটি কোটি নিউরন। এই নিউরনগুলি মস্তিষ্কের ভাষা। এক নিউরনের সঙ্গে অন্য নিউরনের সংযোগে ঘটে নতুন রসায়ন। তখন নতুন ভাবনা, যুক্তি ও অনুভবের ভাষা জেগে ওঠে। নিউরনে নিউরনে সংযোগ ঘটিয়ে দিতে পারে পর্যবেক্ষণ, চিন্তন, কথোপকথন, যুক্তি প্রদর্শন, সৃজনধর্মী বা হাতে-নাতে কাজ এবং সংকেত বা পড়া ও লেখা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিউরন-জাত নতুন বোধ বা অভিজ্ঞতাকে অনুভব করতে গেলে বা প্রকাশ করতে গেলে অথবা আদানপ্রদান করতে গেলে, এমনকি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গেলেও সংশ্লিষ্ট বিষয় উপযুক্ত শব্দ ও শব্দগুচ্ছ প্রয়োজন হয়। মানুষ তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই নিজেদের মতো শব্দ ও শব্দগুচ্ছ তৈরি করে নিউরনের এই বিচিত্র সংযোগকে আরও সম্পন্ন করে তুলেছে। ফলে ধীরে ধীরে মানুষের মস্তিষ্কে লক্ষ লক্ষ শব্দের ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন শব্দও তৈরি হচ্ছে মানুষের মগজে। অন্যদিকে একটি নিউরন যেহেতু মস্তিষ্কের আকাশে একইসঙ্গে ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে স্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই সে একই সঙ্গে একই জাতীয় অনেক ভাল তথ্য ও বোধকে মানুষের মগজে উদ্ভাসিত করতে পারে। অবশ্যই তার সঙ্গে যুক্ত থাকে নানান শব্দ ও শব্দগুচ্ছ। এই শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলি জালের মতো একটা ফাঁদ তৈরি করতে পারে। ফলে একটা নিউরনের সংযোগের সাথে এখন অনেক নিউরনের সঙ্গে একই সময়ে সংযোগ তৈরি হতে পারে। ফলে মানুষ একই ধরনের সম্পর্কযুক্ত শব্দ ও শব্দগুচ্ছ এক সাথে স্মৃতিতে আনতে পারে। ফলে ছোট ছোট অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির সম্মেলনে একটা বৃহত্তর ভাবনা, ধারণা বা

বোধে পৌঁছতে পারে। একেই বলা যেতে পারে 'শব্দজাল ও শব্দভাণ্ডার নির্মাণ'। আট থেকে বারো বছর বয়স এতই গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় যে এই সময় শিশুর মস্তিষ্কের মধ্যে ঘটে যায় নিউরন নিউরনে চকিত সংযোগ। এটি বিপুল পরিমাণে ঘটে। ফলে কোনও কিছু ভাবতে ও প্রকাশ করতে তার মধ্যে দুর্দম ইচ্ছা গড়ে ওঠে। কথা বলার আর নিজের হাতে করে দেখার ইচ্ছে থেকে এটাই বোঝা যায়। অন্যদিকে শব্দ বা কথা শুনতে শুনতে, কিছু দেখতে দেখতে বা প্রয়োগ করতে করতে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির সঙ্গে তার একপ্রকার অভিযোজন তৈরি হয়ে যায়। তখন যে কোনও কথা শুনতে, বলতে, পড়তে, লিখতে, কোনও কিছু চিন্তা করতে, যে কোনও মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে ওই শব্দগুলিই সাহায্য করে। নিউরনে নিউরনে সংযোগ লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে জাত সংশ্লিষ্ট শব্দের ভাণ্ডার হল শিশুর মেধা ও বোধশক্তি। ফলে অভিজ্ঞতা বাছাই করে সংশ্লিষ্ট শব্দচর্চা বারো/তেরো বছর পর্যন্ত জারি রাখলে শিশুর মস্তিষ্কের সম্মুখ কক্ষ সবটাই উপযুক্তভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এই বিজ্ঞানটি জানলেই শিশুর সব কাজের পেছনে আসল ক্ষমতার উৎসটি জানা যায়। তা হল অভিজ্ঞতাভিত্তিক শব্দজাল ও শব্দভাণ্ডার নির্মাণ। এই সত্যটিকে অবহেলা করে বিদ্যালয়ে নিতান্তই প্রথাগত পঠন-পাঠন ও অনুশীলনীর কাজ করা হলে তাতে তার দক্ষতার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটে না। অন্যদিকে বিদ্যালয় ব্যবস্থায় এই মৌলিক জীবনশৈলীটি (Life-skill) মাথায় রেখে আদৌ কাজ হয় না। আমাদের গৃহীত প্রকল্পে এই জীবনশৈলীটির চর্চাকে পরিকল্পনামাফিক সামনে রেখে বাকি সবকিছু সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এখানে একটা বড় প্রশ্ন রয়েছে। এই জীবনশৈলীর চর্চা সাক্ষরতা ও গাণিতিক চর্চা থেকে কতটা ভিন্ন। সাধারণভাবে সাক্ষরতার চর্চা হল, লিখিত বর্ণ ও শব্দের সাহায্যে শিক্ষাচর্চা। বিদ্যালয়স্তরে প্রচলিত ব্যবস্থা এই সাক্ষরতার চর্চা দিয়েই সংঘটিত হয়। ফলে দুটি ক্ষেত্রকে একই বলে মনে করা অবান্তর চিন্তা নয়। তবু যদি আমরা আরও একটু গভীরে বিশ্লেষণ করি তবে দেখব, যে চারটি মূল সার্মথ্য একটি শিশুকে জাগতিক বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে তা হল শ্রবণ, কথন, পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশন। শোনা ও বলার সঙ্গে লিখিত বর্ণ বা অক্ষরের কোনও সংযোগ নেই। তবে শেষের দুটি সামর্থ্য অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশনের ক্ষেত্রে কিছুটা সংযোগ রয়েছে। পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশনের দুটো দিকই আছে। এক্ষেত্রে কখনও বর্ণ বা অক্ষর প্রয়োজন হয়, আবার কখনও প্রয়োজন হয় না। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বর্ণ, অক্ষর ও শব্দের লিখিত রূপের সাথে অর্থপূর্ণ সংযোগকে পঠন দক্ষতা (Reading skill) বলে। এটা সরব বা নীরব দু'রকমই হতে পারে। অন্যদিকে বর্ণ, অক্ষর ও শব্দ ব্যবহার করে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করাই হল লিখন দক্ষতা (Writing skill)। প্রকৃতিকে গভীরভাবে দেখতে বর্ণের লিখিত রূপের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এও এক প্রকার পড়া। বন্যপ্রাণীর আচার-আচরণ ও আবহাওয়ার রকমফের নজর করাও তো একপ্রকার পঠন দক্ষতা। এক্ষেত্রে শুধু বর্ণ, অক্ষর ও শব্দের লিখিত রূপের সঙ্গে সংযোগ প্রয়োজন হয় না। মানুষ নাটক, গান, হাতের কাজ, হাতে-নাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনও বার্তা বা ভাব প্রকাশ করতে পারে। সেক্ষেত্রেও বর্ণ, অক্ষর ও শব্দের লিখিত রূপের প্রয়োজন হয় না। ফলে যে ক্ষেত্রে লিখিত রূপের প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে কার্যকরী সাক্ষরতার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে এইসব ক্ষেত্রে লিখিত না হোক, অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক নিউরন সংযোজন ও সংশ্লিষ্ট শব্দ ও শব্দগুচ্ছের সংযোগ ব্যাপকভাবেই ঘটে। তাই শব্দজাল ও শব্দ ভাণ্ডার নির্মাণের কাজ শুধুমাত্র বিদ্যালয় ভিত্তিক সাক্ষরতার কাজ নয় বরং এটি শিশুর উপযুক্ত শব্দ নির্ভর মেধা ও বোধ নির্মাণের কাজ এবং এক সামাজিক উন্নয়নের কাজ।

অন্যদিকে, একথাও বাস্তব যে যেহেতু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা একমাত্র লিখিত বস্তুর পঠন-পাঠন ও লিখনের মধ্যে দিয়েই সম্পন্ন হয়, তাই বিদ্যালয় ভিত্তিক কাজ করতে হলে জ্ঞানের লিখিত রূপটিকে একেবারে অবহেলা করা সম্ভব নয়। এছাড়াও শিশুর জীবনযাপনের মধ্যে এই লিখিত রূপের অনুপ্রবেশ ঘটেছে গভীরভাবে। একটি আট (৮) বছরের শিশুর কাছে লিখিত উপকরণ ভীষণই জরুরি একটি বিষয়। নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ নিশ্চয়ই বিদ্যালয় ভিত্তিক সাক্ষরতার চর্চা নয়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে বইপত্র নামিয়ে এনে শিশুদের মধ্যে ছবি সমন্বিত সহজ ছড়া ও গল্পের বইকে লিখিত উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা নিশ্চয়ই চেনা সাক্ষরতার ফরম্যাটে পড়ে না। বিদ্যালয়ে মিছিল করতে যে ছোট ছোট পোষ্টার লিখতে হবে সেখানেও লিখিত রূপের চর্চা আছে। তবু তা প্রচলিত অর্থে সাক্ষরতার চর্চা নয়। তেমনই গ্রামে সমীক্ষা করতে গিয়ে সমীক্ষাপত্রে দু'চারটি শব্দ পড়া এবং মতামত শুনে দু'এক কথায় লিখে রাখাকেও কি আমরা সেই অর্থে সাক্ষরতার বলতে পারি? না, তা পারি না। শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক করতে গিয়ে যে বৃহত্তর কৃত্যালি নেওয়া প্রয়োজন

হয় এগুলি তার এক একটা উপকরণ মাত্র। এখানে পাঠ্য বইয়ের কোনও অনুশীলনী নেই। প্রয়োজনীয় লিখিত উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা যেমন প্রাসঙ্গিক হতে পারে, তেমনই এর পাশাপাশি শিশুর ন্যূনতম পঠন ও লিখন সামর্থ্য কার্যকরীভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটাতে তাই নানান লিখিত উপকরণের ব্যবহার ভীষণই প্রয়োজন।

এবার দেখে নেওয়া যাক, কী কী ধরনের পদ্ধতি ও লিখিত উপকরণ বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ব্যবহার করা যায়।

## ক) মানস মানচিত্র নির্মাণ ও শব্দার্থ আবিষ্কার পদ্ধতিঃ

বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং শ্রেণিকক্ষে মানস মানচিত্র (Mind mapping) নির্মাণের উদ্দেশ্য হল, এক একটি অভিজ্ঞতা ও ভাবনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট শব্দ ও শব্দগুচ্ছের চর্চা। এরজন্য শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ড বা পোষ্টার পেপার ব্যবহার করতে পারেন। মূল ভাবনাটিকে প্রথমে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে সেগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিকে সাজানোর চেষ্টা করতে হবে। এই শব্দগুলির লিখিত রূপ কোনও কার্টিজ পেপারে লেখার ব্যবস্থা হলে তা পরবর্তীকালেও অনেকবার ব্যবহার করা যেতে পারে। পঠনে পিছিয়ে পড়া শিশুদের ক্ষেত্রে এই লিখিত উপকরণটি ব্যবহার করা যায়।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, বিষয়ঃ বীজ থেকে ফুল ও ফল [তৃতীয় শ্রেণির 'ফুল' নামের পাঠ থেকে]

এই প্রক্রিয়াটি শিশুর জানা, কিছুটা অজানা অভিজ্ঞতার মধ্যেও পড়ে।

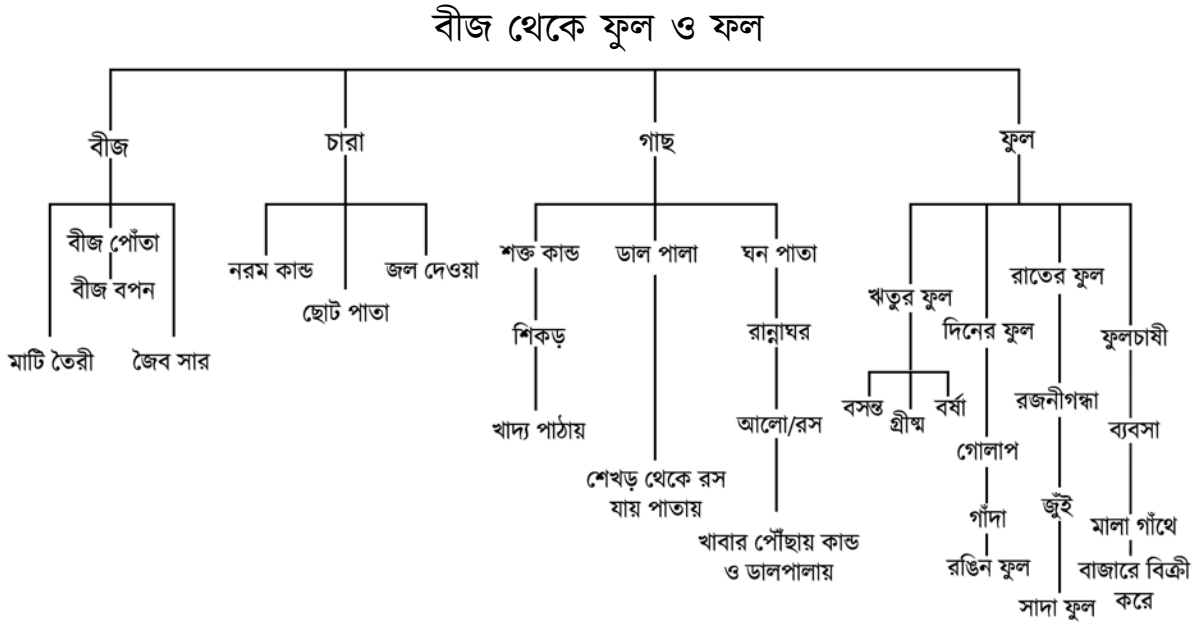


এইভাবে শিশুর চিন্তাকে উস্কে দিয়ে তাদের জানা ও অজানা নানান শব্দ তুলে আনতে হবে। কথ্য ও স্থানীয় ভাষার শব্দ প্রয়োজনে প্রথমেই তুলে আনতে হল। পরে ওই শব্দকে মান্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে হবে।

## খ) প্রাসঙ্গিকভাবে শব্দার্থ আবিষ্কার পদ্ধতি

শিক্ষক-শিক্ষিকা যখন 'মানস-মানচিত্র' করাবেন সে সময়ে শিশুদের অজানা শব্দের অর্থ সরাসরি বলে দেবেন না। প্রয়োজনে নানান ইঙ্গিত, সূত্র প্রদান করবেন; এমনকি, মৌখিকভাবে ঘটনা বা পরিস্থিতির বর্ণনা করে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ ঘটিয়ে শিশুদের শব্দার্থ আবিষ্কারে সাহায্য করতে হবে। এখানে অনুমান (Guessing) এবং আবিষ্কার (Discovery) এই দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দু-একজন শিক্ষার্থী না পারলে অন্যান্য শিক্ষার্থীকে দিয়ে ওই কাজটা করানো যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করিয়ে শব্দের অর্থ ও তার প্রয়োগ

তুলে আনা যেতে পারে। পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য কথ্য ভাষা ও মান্য ভাষা পাশাপাশি ব্যবহার জরুরি।

## গ) পঠনের জন্য কার্ড নির্মাণঃ

একটি শ্রেণিকক্ষে যেহেতু নানান মানের শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকে তাই পঠনে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য শব্দজালে উঠে আসা সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি নিয়ে সহজ ও সহজতর পাঠের কার্ড নির্মাণ করে রাখা জরুরি। এছাড়াও থাকতে পারে আলোচিত বিষয় নিয়ে শব্দের কার্ড। মান অনুসারে শিশুকে এগুলি স্ব-পঠনের জন্য দেওয়া যেতে পারে। পুরুলিয়াসহ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিকে ও উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বা পিছিয়ে পড়া এলাকার শিশুদের জন্য যে পঠনকার্ড নির্মাণ করতে হবে তাতে ছবির পাশে কথ্য শব্দ এবং তার পাশে মান্য ভাষার শব্দটি রেখে শব্দকার্ড তৈরি করা যায়। পঠনে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য ওই কথ্য ও মান্য ভাষার শব্দ ও ছবি প্রয়োগ করে সহজতর পাঠ তৈরি করা যায়। বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি বা সৃজনমূলক কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিশুদের একদিকে যেমন শিক্ষণ কার্ডের মাধ্যমে শব্দগুলির লিখিত রূপের পরিচয় ঘটাতে সাহায্য করবেন, তেমনই অন্যদিকে মান অনুসারে সহজ ও সহজতর পাঠগুলি পড়তে দেবেন। এতে শিশুরা আরাম ও স্বস্তিবোধ করবে। কার্ডগুলি ছবি সমন্বিত হলে বিষয়টি আরও কার্যকরী হবে। নিজে নিজে পড়তে পড়তে শিশু শব্দের অর্থ যেমন আবিষ্কার করতে পারবে তেমনই পাঠের মধ্যে একটি বাক্যের ও বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে যে সংযোগ আছে তা উপলব্ধি করতে পারবে। এগুলি সবই পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য এবং স্ব-পঠনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এই ধরনের পাঠের ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের জন্য স্ব-পঠনের আদর্শ লক্ষ্যমাত্রা হল-

ক) তারা প্রতি মিনিটে অন্তত ৯০ থেকে ১১০টি শব্দ যতিচিহ্ন সহযোগে পড়তে পারবে।

খ) বিরাম দিয়ে সংশ্লিষ্ট পাঠ অর্থপূর্ণভাবে পড়তে পারবে।

গ) প্রতিটি বাক্যে অন্তত সাতটি শব্দের ব্যবহার হলে সমস্যা নেই।

ঘ) প্রতিটি বাক্যে অনধিক একটি যুক্তবর্ণ থাকলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ঙ) পাঠ্য বিষয় থেকে মূল শব্দগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।

চ) পাঠাংশে মূল চরিত্র, স্থান এবং সময় নিয়ে মন্তব্য করতে পারবে।

ছ) কখন, কোথায়, কীভাবে এইসব প্রশ্নের উত্তর সহজে দিতে পারবে।

জ) 'কেন' জাতীয় প্রশ্নের উত্তর সরলভাবে দিতে পারবে।

ঝ) দুটি বস্তু বা পরিস্থিতিকে সরলভাবে তুলনা করতে পারবে।

ঞ) দু-একটি দুরূহ শব্দ ব্যবহার হলে আশেপাশের শব্দ ও বাক্যগুলি বারবার পড়ে সংশ্লিষ্ট শব্দের অর্থ সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারবে।

ট) পাঠ্যাংশটিকে নিজের কথায় বর্ণনা করতে পারবে এবং উপযুক্ত শব্দগুলিকে ব্যবহার করতে পারবে।

উপরের লক্ষ্যমাত্রা মাথায় রেখে প্রথমে স্ব-পঠনে কিছুটা দুর্বল শিশুদের জন্য 'সহজতর পাঠ' তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে তারা মিনিটের ৭০টির বেশি শব্দ সঠিকভাবে পড়তে পারবে না এবং ২০০/২৫০টি শব্দের একটি পাঠ্যাংশে ২/৩টির বেশি যুক্তবর্ণের ব্যবহার ঠিক হবে না। দুরূহ শব্দগুলিকে একাধিকবার ব্যবহার করতে হবে। বাক্যে ৪/৫টির বেশি শব্দ যেন না থাকে তা দেখতে হবে। এটি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠন উপযোগী হবে।

অন্যদিকে যদি স্ব-পঠনের ক্ষেত্রে আরও দুর্বল শিশু থেকে থাকে তবে তাদের জন্য আরও 'সহজতর' পাঠ শিক্ষককে তৈরি করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের পঠন ক্ষমতা হবে মিনিটে ৩০ থেকে ৫০টি শব্দ। যুক্তবর্ণের ব্যবহার এখানে থাকবে না। প্রতিটি বাক্যের দু-তিনটির বেশি শব্দ থাকবে না। আরও দুর্বল হলে সেই সমস্ত শিশুদের জন্য প্রথম শব্দচার্ট তৈরি করতে হবে। শব্দচর্চায় উঠে আসা শব্দ এবং পাঠ্য বইয়ের ব্যবহৃত শব্দগুলির মৌখিকভাবে চর্চা হয়ে গেলে, সেগুলি নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা কয়েকটি শব্দচার্ট তৈরি করবেন এবং দুর্বলতর শিশুদের ওই চার্ট পড়তে দেবেন

এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন মানের 'সহজতর' পাঠগুলিও  পড়তে দেবেন। প্রতিটি শিক্ষকই তার শিক্ষার্থীর মান অনুসারে এই কৃত্যালিটি পরিচালনা করবেন।

## ঘ) অন্যান্য লিখিত উপকরণঃ

পাঠ চলাকালীন উপযুক্ত সময় বিভিন্ন তথ্য যোগান দিতে অনেক সময় কিছু লিখিত উপকরণ প্রয়োজন হয়। 'বীজ থেকে ফুল'- এই অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করতে ফুলের ছবি ও তার পাশে ফুলের নাম, কোন কালে ফোটে, গন্ধ আছে বা নেই, রাত্রি বা দিনের ফুল কিনা তা নিয়ে দু-তিনটি শব্দ সমন্বিত ফ্লিপকার্ট তৈরি করা যায়। সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য খুব সহজ সমীক্ষাপত্র থাকতে পারে। ওখানে দু'একটি শব্দ লেখার সুযোগ থাকতে পারে; আবার শুধুমাত্র টিক( ) দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এই সমীক্ষাপত্রগুলি দলে সরবরাহ করবেন এবং স্ব-পঠনের জন্যে বলবেন। এখানে পিছিয়ে শিশুরা এগিয়ে থাকা শিশুদের সাহায্য নিয়ে এই সমীক্ষাপত্রটি পড়তে এবং দু-এক কথা লিখতে চেষ্টা করবে। মূল যে শব্দগুলি নিয়ে সমীক্ষাপত্রটি তৈরি হবে, তা অবশ্যই মানস মানচিত্রের মাধ্যমে পূর্বেই আলোচনা করে নিতে হবে। কোনও সচেতনতা মিছিল সংগঠিত করতে গেলে যে পোস্টারগুলি তৈরি করতে হবে তা শিশুরা যেন নিজেরাই তৈরি করে। ফলে বেশ কিছু শব্দ লেখা ও পড়ার সুযোগ এখানেও থাকছে। খবরের কাগজের কোনও অংশকে বর্ধিত আকারে ফটোকপি করে শিশুর পঠনের জন্য দেওয়া যায়। বিভিন্ন কাজে যাতে শিশুরা বেশি বেশি স্ব-পঠনে ও স্ব-লিখনে যেতে পারে তার সুযোগ তৈরি করে এই উপকরণগুলি আগেই প্রস্তুত করা যায়।

## ঙ) শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক গ্রন্থাগার নির্মাণ

শিশুকে পরোক্ষ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করতে হবে নানান ধরনের ছবির বই, ছবিতে দু-একটি শব্দ লেখা বই, বড় হরফে ছাপা সহজ গল্পের বই, ছবি সমন্বিত ছড়ার বই। সবই সংশ্লিষ্ট উপভাবমূলের অনুসারী হলে ভাল হয়। এটা ঠিক যে, এই প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য বিষয়ভিত্তিক এমন আদর্শ বইপত্র কম রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বাজারে পাওয়া যায় এমন দু-একখানি বই নিয়েই এই উদ্যোগ শুরু করতে হবে। পরে এই ভাণ্ডারকে আরও সম্পন্ন করে তুলতে হবে অন্য কোনও উদ্যোগ নিয়ে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের 'সিসিমপুর'-এর উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্'-এর উদ্যোগে এই ধরনের গঠনমূলক কাজ গ্রহণ করা যেতেই পারে। তার কারণ, জেলাস্তরে এই প্রকল্পের অধীনে নানা ধরনের গল্প ও শিশুদের অভিনব ভাবনা উঠে আসতে পারে। সেগুলি নিয়ে একটি নির্দিষ্ট লেখক গোষ্ঠী এগুলি রূপদান করতেই পারেন। শিশুদের নিজস্ব কাজ নিয়ে তৈরি এমন পুস্তিকার প্রকাশ শিশুদের আকৃষ্ট করবে। এক্ষেত্রে শিশুদের আঁকা ছবি, লেখা ছড়া, কোনও বিচিত্র ভাবনা, রূপকথার গল্প, মজার যুক্তি, অদ্ভুত কল্পনা নিয়ে নানা রকমের লিখিত উপকরণ প্রকাশ করা সম্ভব। যা জেলা ভিত্তিক প্রকাশ করা যেতে পারে।

## চ) দেওয়াল পত্রিকা ও শিশুদের পত্রিকা প্রকাশ, বিগবুক ও নোটবুক ব্যবহার

প্রতিটি বিদ্যালয়ে 'দেওয়াল পত্রিকা' তৈরি হতে পারে। সেখানে শিশুদের লেখা ছবি অলংকরণ স্থান পেতে পারে। অ্যাহেডের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে শিশুদের লেখা নিয়ে নিয়মিত একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারে। অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি করে 'বিগবুক' থাকলে তারা ওখানে সংগৃহীত নানান পাতা, ফুল, ছবি, হাতের কাজের নিদর্শন চিটিয়ে রাখতে পারে এবং তার নীচে দু-এক শব্দে সেটির পরিচয় লিখে রাখতে পারে। নোটবুক হল, শিশুর নিজের অভিজ্ঞতা দু'একটি কথায় লিখে রাখার জন্য শিখন উপকরণ। প্রথমে একটু অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের দেওয়া যায়, পরে সব শিশুকেই ওটা ব্যবহারের জন্য দিতে হবে।

## ২) বহির্বিদ্যালয়ে বাস্তবের সঙ্গে সংযোগসাধন এবং প্রাসঙ্গিক কৃত্যালিঃ

বাস্তব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শিশুর যে নেই, তা নয়। তবে ওই অভিজ্ঞতার কিছুটা তার জানা, কিছুটা অজানা। এখন শুধু প্রযোজন তাকে সচেতনভাবে এবং পরিকল্পনামাফিক সরাসরি ওই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করানো। যাতে সে তার জানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে অজানা অনেক বাস্তবকে সংযুক্ত করতে পারে এবং নিজের জ্ঞানকে পুনর্নির্মাণ (Reconstrict)

করতে পারে। এক্ষেত্রে শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, এখানে শ্রবণেরও ভূমিকা অপরিসীম। মন দিয়ে শোনা ও আলোচনা করা, কী বললেন তা বোঝা এবং সেইসঙ্গে তার মূল বক্তব্য ও শব্দকে নোটবুকে বা সমীক্ষাপত্রে লিখে রাখা এই চারটি বিষয়ও এখানে রয়েছে। শিক্ষককে তাই যে কোনও পাঠ্যাংশের অভ্যন্তরে নিহিত শিশুর জানা-অজানা বাস্তব অভিজ্ঞতাকে খুঁজে বের করতে হবে। সেগুলির মধ্যে ওই এলাকায় যা যা প্রত্যক্ষভাবে শিশুর সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো যায়, তা নিয়েই সংগঠিত করতে হবে বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি। শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে এই অভিজ্ঞতাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবে এলাকা পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে। এখানে তিনটি পদ্ধতিতে বাস্তব জগতের সঙ্গে শিশুর সংযোগ ঘটানো যায়।

## ক) চারপাশে প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণঃ

সংশ্লিষ্ট উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে মানুষ, নদী, জঙ্গল, জলাশয়, উদ্ভিদ, লোকালয়, বিভিন্ন স্থান, পশুপাখি, পতঙ্গ ও পোকামাকড় ইত্যাদির গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা এই পদ্ধতির একটি রূপ। এখানে শুধু দেখা নয়, দেখে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, কার্যকারণ সম্পর্ক, কোনও জীবিত প্রাণীর নানান আচরণের গূঢ়রহস্য, বস্তু ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে নানান তথ্য জানা ও খুঁজে বের করার মতো কাজ এখানে ঘটে। শিশুর সহজাত দক্ষতা হল অনুসন্ধিৎসা, তাকে ব্যবহার করেই এই কৃত্যালি গড়ে তুলতে হবে। যেমন কোনও বাজার পরিদর্শন করে শিশুরা যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক এবং ক্রেতাদের নিজের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পার্থক্য (আর্থিক, সামাজিক, দৈহিক, আচরণগত) তা দেখে নিরূপণ করতে সমর্থ হয়, তখন বুঝতে হবে বাস্তবের সঙ্গে শিশুর সংযোগ সফলভাবে হচ্ছে। এবার ওই বোধকে উপযুক্ত দু-এক কথায় প্রকাশ করতে পারলে, এই পর্যবেক্ষণ কৃত্যালি সার্থক হয়ে যায়।

## খ) নিজের লোকালয়ে অবস্থিত নানান সামাজিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ও মানুষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাঃ

সংশ্লিষ্ট উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকালয় পরিদর্শন ও সেখানকার মানুষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা, সমীক্ষা করে দেখা, মন দিয়ে শোনা, যা শোনা গেল তা বোঝার চেষ্টা করা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নমুনা ও নিদর্শন সংগ্রহ করা, যা আলোচনা হল তা দু-এককথায় সমীক্ষাপত্রে বা নোটবুকে লিখে রাখা এবং এই স্থানীয় জ্ঞানকে পাঠের বৃহত্তর জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হল এই কৃত্যালির আর একটি রূপ। এখানে শিক্ষার্থী তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজের লোকের সঙ্গে একা অথবা দলবদ্ধভাবে দেখা করতে পারে এবং শিক্ষকের দেওয়া বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারে। কোনও বিশিষ্ট মানুষের সাথে বা তাঁর পরিবারের সাথেও তারা দেখা করতে পারে। একই সাথে যে সমস্ত সামাজিক, আধা-সরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে তাও পরিদর্শন করা যায় এবং কৃষি কর্মী, আশাকর্মী, রেশন ডিলার, পিয়ন, রাজমিস্ত্রি, কামার, কুমোর, মৃৎশিল্পীর মতো কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা যায়। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কৃষি দফতর, বনবিভাগের অফিস, বিডিও অফিস, পোস্ট অফিস, ব্যাংক, রেশন দোকান এবং জনগ্রন্থাগার পরিদর্শন করতে পারে শিক্ষার্থীরা। যেমন 'রেলস্টেশনের অভিজ্ঞতাকে'- পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কোনও স্টেশন থাকলে তা শিশুরা পরিদর্শন করতে পারে। এইভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এলে শিশুরা পাঠ্য বইয়ের অনেক বিষয়ই খুব সহজে আত্মস্থ করতে পারে।

## গ) মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সঙ্গে হাতের সংযোগসাধনঃ

শিশুর নিজের হাত একটি সংবেদনশীল হাতিয়ার যাকে ব্যবহার করে শিশু তার নিজের মেধা ও হৃদয়বৃত্তিকে প্রসারিত ও যুক্তিনির্ভর করে তুলতে পারে। শিক্ষাবিদ্ সতীশ কুমার 'হাতের মাধ্যমে শিক্ষা'র ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে শিশুর শিক্ষা 'হাত' দিয়ে শুরু করা উচিত। এখানেও শিশুর কিছুটা জানা কিছুটা অজানা অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক নানা ধরনের হাতে-নাতে কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারেন। যেমন 'বীজ থেকে ফুল'- অংশে বিদ্যালয় চত্বরে ফুলের বাগান তৈরির প্রকল্প নেওয়া যায়। 'মাটি দূষণ' নিয়ে তার ধারণাকে আরও পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতায় পরিণত

করতে এলাকায় প্লাস্টিক বর্জনের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া যায়। এইসব প্রকল্পগুলি শিক্ষার্থীকে কাজের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গীর মুখোমুখি দাঁড় করায়। এতে তার যুক্তি-বিচারবোধও যেমন বাড়ে, তেমনই নানা ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধেরও বিকাশ ঘটে।

## এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্যঃ

১) তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করতে পারেন বা শিক্ষার্থীকে একা একা কাজটি করতে বলতে পারেন।

২) যে বিষয়টি নিয়ে বর্হিবিদ্যালয়ে কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আগেই তৈরি করে দিতে হবে।

৩) পর্যবেক্ষণ হোক, সমীক্ষা হোক বা নিদর্শন সংগ্রহ হোক সবক্ষেত্রেই একটি করে সংক্ষিপ্ত ও সরল তথ্য সংগ্রহের উপযোগী ফর্ম তৈরি করে নিতে হবে এবং তা শিশুদের দলে দলে ভাগ করে দিতে হবে।

৪) শিক্ষক-শিক্ষিকা আগে থেকে ক্ষেত্র সমীক্ষার স্থান নির্বাচন করবেন এবং এলাকায় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে রাখবেন। অভিভাবকদের সভা অনুষ্ঠান করে তাদের এই বিষয়ে সচেতন করবেন এবং কীভাবে তারা তাদের সন্তানদের সাহায্য করবেন সে বিষয়ে অবগত করাবেন।

৫) শিশুরা যাতে ফর্মে প্রদত্ত টেবিলটি পড়তে পারে এবং বুঝে নিতে পারে তারজন্য দলের মধ্যে উপযুক্ত সাহায্য দান করবেন।

৬) যে ক্ষেত্রে শিশুরা একা একা তাদের পরিবার এবং পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে, সেক্ষেত্রে দলগত কাজ হবে শ্রেণিকক্ষের মধ্যে। তথ্য সংগ্রহের পর তারা দলগতভাবে ওই তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা দলের কাছে কোনও একটি চ্যালেঞ্জ সরলভাবে সমাধান করার জন্য উপস্থাপনা করবেন।

৭) অন্যক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দলগতভাবে গ্রাম পরিক্রমা করে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং পরিবেশ বা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করবেন। শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে দলগতভাবে শিশুরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেওয়া চ্যালঞ্জগুলির সমাধান করার চেষ্টা করবে। তাদের মতামত নোটবুকে লিখে রাখবে।

৮) শিক্ষক-শিক্ষিকারা নজর রাখবেন যাতে ওই বিষয়ে মানস মানচিত্রের মাধ্যমে যে শব্দগুলির চর্চা ইতিমধ্যে হয়েছে শিশুরা সেই শব্দগুলির উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারে এবং সমীক্ষাপত্রেও যাতে ওই শব্দগুলির ব্যবহার হয়।

৯) এছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকা একইভাবে হাতে-নাতে কাজ করার জন্য কিছু প্রকল্প নিতে পারেন। এলাকায় বনসৃজন প্রকল্প গ্রহণ, প্লাস্টিক বিমুক্তিকরণের মতো উদ্যোগকেও এই কৃত্যালিতে যোগ করে দিতে পারেন। এই কৃত্যালিতে যে কাজটি সচেতনভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের করতে হবে তা হল ভাবপ্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে বারে বারে শিশুর কাছে তুলে ধরতে বা ব্যবহার করতে দেওয়া।

## এই কৃত্যালির জন্য যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে তা হলঃ

বিগবুকঃ সংগৃহীত, পাতা, ফুল, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য

নোটবুকঃ দু'এককথায় আলোচনা লিখে রাখার জন্য

সমীক্ষাপত্রঃ সরল ভাষায় সমীক্ষাপত্রে কখনও লেখা কখনও টিক দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

হাতিয়ারঃ হাতে হাতে কাজ করার জন্য নানান হাতিয়ার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংরক্ষণ।

সামাজিক সংগ্রহশালাঃ প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে এমন একটি কর্ণার তৈরি করতে হবে যেখানে বাস্তব জগৎ থেকে সংগৃহীত সব নিদর্শন ও ছবি ছোট ছোট কৌটো বা শিশি বা বাক্সে গুছিয়ে রাখা যায়।

## ৩) লোকজ মাধ্যমের ব্যবহার ও সৃজনশীল কৃত্যালি

শিশু কোনও বিমুর্ত ধারণা উপলব্ধি করতে পারে না। তারজন্য কোনও না কোনও এমন মাধ্যম লাগে যেখানে বিমূর্ত ধারণাকে সহজেই শিশুর কাছে মূর্ত করে তোলা যায়। ধরুন, সামাজিক সহযোগিতা। এটি শুধু বুঝিয়ে বললে শিশু তার উপলব্ধির জায়গায় নাও পৌঁছতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা কোনও গল্প বলা বা নাটক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের বোধের কাছাকাছি সহজেই যেতে পারি। আবার ধরুন, "শিশুর কল্পরাজ্যের চরিত্র পরি" [তৃতীয় শ্রেণি, পাঠ, 'ফুল']। এই ধারণা গল্প বলা ও গল্প শোনার মধ্যে দিয়ে যেমন করা যায় তেমনই 'পরি' নিয়ে নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়েও হয়। অন্যদিকে শিশুর পরিবারে ফেলে দেওয়া পুতুল ও কাপড়-চোপড় ব্যবহার করে শিশুরা 'পরি' তৈরি করতে পারে। ওই পরিকে তারা পৃথিবীতে নামিয়ে এনে কল্পনার আশ্রয়ে নানান গল্প নিজেরাই তৈরি করতে পারে। শিশুর মধ্যে নান্দনিক বোধ, পুনঃসৃজন করার ক্ষমতা, শূন্য থেকে সম্পূর্ণতায় যাওয়ার ইচ্ছা, আনন্দবোধ, লাগাতার লেগে থাকার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে। এই কৃত্যালির চর্চা, ছড়া, গান, বাদ্যযন্ত্র চর্চার মধ্যে দিয়ে হলে তার মধ্যে ছন্দবোধ ও সৃজনশীলতা ব্যাপকভাবে তৈরি হতে পারে। শিশুর মধ্যে যে অনুকরণ করার ইচ্ছা থাকে শুধু তাকে উৎসাহ দিয়েই এতসব নতুন গুণের চর্চা হতে পারে। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু চর্চা এককভাবে (Solo) সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে দলগতভাবে ওই চর্চা করলে, শিশুর মধ্যে দলবদ্ধভাবে কাজের আনন্দ ও ইচ্ছা, পারস্পরিক সহযোগিতা, একে অপরের কথা মন দিয়ে শোনা এবং যৌথভাবে অনুমান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হতে পারে। একই সাথে স্থানীয় লোকজ মাধ্যমকে প্রয়োগ করলে শিশু অনেক বেশি আরাম বোধ করে। যে কোনও কৃতালিকেই খুব 'নিজের' বলে মনে হতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টিও শিশুর জীবনের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।

বিভিন্ন ধরনের সৃজনমূলক কাজ এই কৃত্যালির অধীনে পড়েঃ

## ক) নাটিকা উপস্থাপনাঃ

এটি মূলত যৌথ পরিবেশনা। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে পাঠ চলাকালীন কিছুটা অভিজ্ঞতা বাড়লে এই কৃত্যালির প্রয়োগ করা সহজ হয়। শিশুর কাছে বিষয়টির ধারণা স্পষ্ট হয়ে এলে এবং সংশ্লিষ্ট নানা শব্দ অর্থবোধ্য হয়ে উঠলেই শিশুকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই কৃত্যালিতে নিযুক্ত করা যায়। তাই একটু পরের দিকে এটি পরিবেশন করা ভাল। তথ্য আদান-প্রদান করতে করতে শিক্ষক বিষয়ের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেবেন এবং তারপরেই শিশুদের একটি দলকে নির্বাচন করে তাদের নাটিকা উপস্থাপন করতে বলবেন। তার আগে চরিত্র বন্টন করে দেবেন। প্রতিটা চরিত্র কী ধরনের ভূমিকা পালন করবে এবং সম্ভাব্য সংলাপ কেমন হবে সে সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ দেবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক দু'একটি চরিত্রের সংলাপ নিজে বলেও বোঝাতে পারেন। নাটিকার সময়সীমা কখনই দশ (১০) মিনিটের বেশি যেন না হয়। প্রস্তুতির জন্য পনেরো মিনিট এবং শেষে দশ মিনিট সবার আলোচনার জন্য ছেড়ে রাখা যেতে পারে।

ক) যেহেতু এই কৃত্যালি বাংলার শ্রেণিকক্ষে এক নতুন সংযোজন তাই শুরুতে তৈরি নাটিকা শিশুদের শুনিয়ে এবং বিষয়টা বুঝিয়ে তারপর অভিনয় করতে বলা যেতে পারে।

খ) শিশুরা একটু অভ্যস্ত হয়ে উঠলে নাটিকার শুরুটা তৈরি করে এবং কিছুটা দেখিয়ে দিয়ে পরেরটুকু শিশুদের অভিনয় করতে বলা যেতে পারে।

গ) আরও একটু অভ্যস্ত হলে গল্পটি বলে দিয়ে সেই গল্পকে নিজেদের মতো করে অভিনয় করতে বলা যেতে পারে।

ঘ) শেষে যে কোনও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে তা নাটকে রূপান্তরিত করা যায় কিনা এবং নিজেরাই চরিত্র বাছাই ও ভাগাভাগি করতে পারে কিনা তা দেখতে হবে। শেষে স্বাধীনভাবে শিশুরা নিজেরাই ওই নাটিকা উপস্থাপন করতে পারবে।

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, শিশুর যে কোনও পরিবেশনাই হবে ধন্যবাদের যোগ্য। সমস্ত শিশুকে যাতে এই কৃত্যালির মধ্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অংশগ্রহণ করানো যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টির মধ্যেই নাটিকাটিকে সীমিত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

## খ) নৃত্য ও চরিত্রাভিনয়ঃ

এটি একটি একক পরিবেশন। নাটকের মতো এক্ষেত্রেও যে কোনও চরিত্র নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া যায়। এখানে বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। তাই শ্রেণিতে এই কৃত্যালি শুরু করার প্রথম দিকে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বেছে নিয়ে নৃত্য বা চরিত্রাভিনয় করাতে পারলে শিশুদের মধ্যে জড়তা ও ভয় কেটে যাবে। পরবর্তীকালে কোনোদিন নাট্যাভিনয় বা কোনোদিন চরিত্রাভিনয় করানো যেতে পারে। দেখতে হবে এই কৃত্যালির সঙ্গে যাতে বেশি বেশি করে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করা যায়। সমবেতভাবেও নৃত্য পরিবেশন করা যায়। নৃত্যের মধ্য দিয়ে যাতে শিশুর স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতির রূপ বিশেষভাবে প্রকাশ পায় তার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।

## গ) হরবোলাঃ

এটইও একটি একক পরিবেশনা। তবে পরবর্তীকালে একে যৌথ পরিবেশনায় রূপান্তরিত করা যায়। বিভিন্ন শব্দ ও ডাক অনুসরণ করে শ্রোতাকে নির্ভুলভাবে বোঝাতে পারার ক্ষমতা এখানে দেখা হয়। একে যে কোনও পরিস্থিতির বর্ণনাতে ব্যবহার করা যায়। যেমন রেলস্টেশনের অভিজ্ঞতা [তৃতীয় শ্রেণি, পাঠঃ 'নিজের হাতে নিজের কাজ']। এখানে কোনও একটি শিশু বিভিন্ন ধরনের শব্দ তৈরি করে রেলস্টেশনের আবহ সৃষ্টি করতে পারে। একাধিক শিশু এক একটি চরিত্রের বা বস্তুর শব্দ নিজেরা একসাথে পরিবেশন করে একটা সুসংবদ্ধ আবহ নির্মাণ করতে পারে। পরিবেশনার পর নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং বিষয়টির অভ্যন্তরে যে বার্তা আছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারে।

## ঘ) গল্প বলা, গল্প বানানো, গল্প শোনানোঃ

এটি একটি খুবই প্রাচীন কৃত্যালি। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে শিক্ষক নিজে গল্প বলতে পারেন; বাড়ি থেকে শুনে এসে শিশুদের এই ধরনের গল্প উপস্থাপন করতে বলতে পারেন; গল্প শুনে তার গভীরে কী বার্তা আছে, তা খুঁজে বের করতে বলতে পারেন; এলাকায় কেউ ভাল 'গল্প বলিয়ে' থাকলে তাকে ডেকেও গল্প বলা ও শোনার আসর বসানো যেতে পারে। অনেকে মিলে গল্প বানানোর খেলাটি বেশ মজার। সূত্র দিয়ে শিশুদেরকে দলে গল্প বলার ব্যবস্থা করতে পারেন শিক্ষক। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, শিশুরা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ না করতে পারে বা অবান্তর ঘটনার দিকে চলে না যায় তার জন্য মাঝেমাঝে কাহিনীর গতি প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষককে নতুন সূত্র সংযোজন করতে হবে। এই কৃত্যালিতে শিশুর কল্পনা করার ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ে।

## ঙ) ছড়া আবৃত্তি করা, ছড়া লেখা ও অন্ত্যমিলের খেলাঃ

খ্যাতনামা ছড়াকারদের লেখা ছড়া ছাড়াও এলাকার কোনও অখ্যাত লেখকের ছড়াও এই কৃত্যালিতে যুক্ত করা যেতে পারে। শিক্ষক মহাশয় নিজেও ছড়া তৈরি করে শিশুদের শিখিয়ে দিতে পারেন। ছড়ার দৈর্ঘ্য সীমিত হতে হবে, যাতে তারা বাড়ি পর্যন্ত ওই ছড়াকে স্মৃতিতে নিয়ে যেতে পারে। ছড়ার মধ্যে যে একটা ছবি/কাহিনী আছে তাও বুঝিয়ে দেবেন শিক্ষক। ছড়া বলার সময় ওই ছবি ও কাহিনী মনে রেখে এবং ছন্দ বজায় রেখে আবৃত্তি করতে বলতে হবে। শিক্ষক নিজে কয়েকবার তা করে দেখাবেন এবং পরে শিশুরা নিজেরা দলে বসে তার চর্চা করবে এবং প্রয়োজনে একে অপরকে সাহায্য করবে। এলাকায় কোনও আবৃত্তিকার থাকলে তাকেও একদিন বিদ্যালয়ে ডেকে এনে ছড়া, আবৃত্তি শোনানো যেতে পারে।

ছড়া বানানোকে একটি মজার খেলা হিসেবে শিশুদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। শুরুতে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে কাহিনী বা ছবি হিসেবে তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে; এরমধ্যে চরিত্রদের নামকরণও করা যায়। পরে ঘটনাগুলি ক্রম আকারে সাজিয়ে নিতে হবে এবং সাথে সাথে অন্ত্যমিলের স্বার্থে ছন্দ রেখে সম্ভাব্য শব্দ যোগান দিতে হবে। যেমন 'মেঘলা ছুটির দিনে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য" [তৃতীয় শ্রেণি/পাঠঃ মন কেমনের গল্প]। এই বিষয়ে ছড়া বানানোর জন্য শিক্ষক গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্যগুলি বলে দিয়ে কয়েকটি অন্ত্যমিল যুক্ত শব্দ দিতে পারেন, যেমন 'গ্রাম-অবিরাম' 'বন্দী-ফন্দি', 'মেঘলা-মজার খেলা', 'জমে জল-খেলে বল' ইত্যাদি। কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গেলে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যে কোনটুকু নিয়ে ছড়া হবে আর তার সম্ভাব্য শব্দ সূত্রই বা কী হবে তা তারা নিজেরাই খুঁজে বের করতে পারবে।

## চ) গান গাওয়া ও কবিতায় সুর দেওয়াঃ

যে কোনও পরিচিত গান একক বা সমবেতভাবে করতে পারার ক্ষমতা সব শিশুর মধ্যেই অল্প বিস্তর রয়েছে। এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে পরিচিত গান শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। শিক্ষক নিজে গেয়ে শেখাতে পারেন বা নিজের মোবাইলে ওই গান রেকর্ড করে তা শিশুদের শোনাতে পারেন। যেমন 'দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও দেশের জওয়ানদের কথা' [পঞ্চম শ্রেণি/পাঠঃ 'বুনো হাঁস'] এখানে নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মবোধক গান শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। গানের শেষে দেশ স্বাধীন বা রক্ষা করতে গিয়ে যাঁরা কষ্ট স্বীকার করেছেন বা করছেন অথবা যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার বিষয়টিকে আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

একই বিষয়ে কোনও কবিতা থাকলে তাতে জনপ্রিয় কোনও সুর আরোপ করা যায় কিনা তাও দেখা যেতে পারে। শিশুরা দু/এক পংক্তির কবিতায় ওই সুরারোপ করে দেখতে পারে। এক্ষেত্রে এলাকায় প্রচলিত লোকসুরের অনুকরণে তা করা যায় কিনা তা চেষ্টা করে দেখতে পারে। যেমন বাউল, কীর্তন, নামগান, লালনের গান, ভাটিয়ালি, ভাওইয়া আদিবাসী গানের সুর ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের গান বা কোনও কবিতায় সুর দেওয়া যায়। এতে শিশুর সৃষ্টিশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে।

## ছ) ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র ও মাটি দিয়ে নতুন কিছু বানানোঃ

সব শিশুর মধ্যেই হাতে-নাতে করে কিছু বানানোর ক্ষমতা আছে। তাদের বোঝাতে হবে যে কোনও জিনিসই ফেলে দেওয়ার নয়। ওইসব জিনিস দিয়েই নানান ধরনের নতুন কিছু তৈরি করা যায়। এরজন্য প্রতিটি শিশুর একটি 'টুল বক্স' তৈরি করে দিতে হবে। অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাক্সটি বানানো যেতে পারে। শিশু ওখানে কাঁচি, সুচ, স্কেল, ব্লেড, উপযুক্ত মাটি, অব্যবহার্য রাংতা, শোলা, রঙ, ফেলে দেওয়া শিশি-বোতল, ডিব্বা, পুঁতি, ছেঁড়া মালা, বিভিন্ন রঙের সুতো, কাপড় ছেঁড়া ইত্যাদি রাখতে পারে। ছবি কেটেও রাখা যায়। যখনই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও কিছু তৈরির সুযোগ আসবে তখনই তাদের ওইগুলি ব্যবহার করে নতুন কিছু তৈরি করতে দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে ফেলে দেওয়া পুতুল থেকে 'পরি' তৈরি হতে পারে; ফাঁকা ডিব্বা দিয়ে জলে ভাসানোর ভেলা তৈরি করা যায়। মাটি দিয়ে মূর্তি ও নানা বস্তু তৈরি করা যায়। একটি শিশু যাই তৈরি করুক না কেন তা ধন্যবাদের হবে এবং তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ওই জিনিসটি দিয়ে সে কী বোঝাতে চাইছে। কীভাবে সে তা তৈরি করেছে তাও বর্ণনা করতে পারে।

## জ) ছবি আঁকা ও রঙ তৈরিঃ

আদিম যুগ থেকে এই কৃত্যালি মানুষের অভ্যাসের মধ্যে রয়েছে। নিজেকে প্রকাশ করতে সবার মধ্যেই ওই শিল্পী মন রয়েছে। শিশুদের মধ্যে এই ক্ষমতা একশো শতাংশ রয়েছে। যে কোনও বর্ণনা বা গল্প ও কবিতার ছবি এবং জিনিসপত্র, পশুপাখি ও গাছ-পালার ছবি শিশুরা সহজেই আঁকতে পারে। অবশ্যই নিজের মতো করে যে কোনও উদ্যোগই এখানে ধন্যবাদের। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে শিশুদের এই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করলে পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও দেখার চোখ তৈরি হয়ে যেতে পারে। ছবিতে রং করতে শিশুরা খুব ভালবাসে তাই বিদ্যালয়ে রঙের ব্যবস্থা বা রঙ পেনসিলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক বস্তু দিয়ে নানান রঙ তৈরি করাও শেখানো যেতে পারে। একটু চুন মিশিয়ে লাল, হলুদ ও অন্যান্য অনেক রঙের নানান রূপ পাওয়া যায়। পাতা থেকে সবুজ রং, বীট সবজি থেকে মেরুন রঙ, গুঁড়ো হলুদ থেকে হলুদ রঙ যে পাওয়া যায় তা তাদের খুঁজে বের করতে বলতে হবে। আঁকা হয়ে গেলে ওই বিষয়বস্তুর পশ্চাতে তার যে ভাবনা ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করতে বলতে হবে। তবে সবসময়ই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই এই অঙ্কনের কৃত্যালিটি ধরে রাখতে হবে।

## ঝ) অভিনব খেলার উদ্ভাবনঃ

ফুটবল,ক্রিকেট ইত্যাদির মতো জনপ্রিয় খেলার বাইরে শিশুর এলাকায় নানান ধরনের খেলা চালু আছে। লুকোচুরি, বউবসন্ত, পিট্টু, দড়িলাফ, হা-ডুডু, রুমালচুরি, ইত্যাদির মতো প্রায় হারিয়ে যেতে বসা স্থানীয় খেলাধূলাগুলিকে চর্চার মধ্যে আনা জরুরি। অন্যদিকে একটা খেলার সঙ্গে অন্য খেলা মিশিয়ে নতুন কোনও খেলা তৈরি করা যায়। এগুলি শিশুর শরীর রক্ষা ও মানসিক স্থিতির জন্য প্রয়োজনীয়। সারা বছর ধরেই শিক্ষক-শিক্ষিকা এই ধরনের স্থানীয় খেলাধূলার চর্চা চালিয়ে যাবেন। তবে কোনও কোনও পাঠ্যাংশে এই খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। যেমন 'শিশুদের মজার খেলাধূলা'[চতুর্থ শ্রেণি/ পাঠঃ 'ছেলেবেলার দিনগুলি'] বা 'শিশুদের মধ্যে মজাদার প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা' বা 'দুই বন্ধুর মধ্যে লড়াই লাগিয়ে আনন্দ উপভোগ' [পঞ্চম শ্রেণি/ পাঠঃ আকাশের দুই বন্ধু']। এখানে সরাসরি খেলাধুলা বিশেষত পারিবারিক খেলাধূলার আনন্দের কথা আলোচনা করা যায়। সেক্ষেত্রে পুরনো খেলা বা নতুন খেলায় শিক্ষক মহাশয় উৎসাহ দিতে পারেন। নতুন খেলা বানানোয় মদত দিতে পারেন। এই সমস্ত কৃত্যালির পশ্চাতে যে প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধের কথা আছে তা হল, সহযোগিতাই আসল সত্য। প্রতিযোগিতা মজাদার হলে ক্ষতি নেই। শিশুর মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে তাতে তারা নতুন নতুন খেলা নিজেরাই তৈরি করতে পারে। যুগ যুগ ধরে তাই হয়ে এসেছে।

## ঞ) অভিনব যন্ত্রপাতি ও মডেল তৈরি করাঃ

শিশুকে বিশেষত পরিবেশবিদ্যার পাঠে এমন নতুন নতুন জিনিসপত্র তৈরিতে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। মাটির মধ্যে মিশে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করতে কোনও যন্ত্র তৈরি করা যায় কিনা, ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র দিয়ে নতুন কোনও বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা যায় কিনা; টুথব্রাশের ছিটে দিয়ে ছবি আঁকা যায় কিনা বা রান্নাঘরের জলকে শোধন করে আবার রান্নাঘরে ব্যবহার আর বর্জ্য পদার্থকে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা-এমনই হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আবিষ্কার শিশু নিজে প্রাত্যহিক জীবনে করতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার সময় তাকে সূত্র ধরিয়ে দেওয়া এবং উৎসাহ ও পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের।

## ট) 'সামাজিক সংগ্রহশালা' নির্মাণঃ

শিশুর এটি প্রাত্যহিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যে সে যখন কোনও নিদর্শন দেখতে পাবে বা নতুন কোনও কিছু তার চোখে পড়বে তখনই সেটির কিছু নিদর্শন শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। ধরুন, শিশু কোনও একটা নতুন উদ্ভিদ রাস্তায় দেখল বা নতুন ধরনের কোনও বুনো ফুল দেখল [তৃতীয় শ্রেণি/'আমাদের পরিবেশ']। এক্ষেত্রে শিশু শিক্ষককে বিষয়টি জানাবেই। শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষার্থীদের সাথে ওখানে গিয়ে ওই উদ্ভিদের বা ফুলের ছবি তুলে আনা। পরে তার ফটোকপি নিয়ে সংগ্রহশালায় রাখা। এরপর এটি কী উদ্ভিদ, কোন কাজে লাগে, ক্ষতিকর কিনা

ইত্যাদি গবেষণা করে দেখবে শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে। পাতা সংগ্রহ, ফুল সংগ্রহ, ছবি, ডাকটিকিট, খবরের কাগজের বিভিন্ন ঘটনার ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে। শিশুদের নিজেদের তৈরি নানান জিনিসও ওই সংগ্রহশালায় রাখা যেতে পারে।

## ঠ) বিদ্যালয় ভিত্তিক অনুষ্ঠান ও প্রকল্পে অংশগ্রহণঃ

সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন ফুলের বাগান তৈরি, দেওয়াল রঙ করার উদ্যোগ, বিদ্যালয়ে প্রবেশের রাস্তা তৈরি, পরিচ্ছন্নতা রক্ষার নানা নিয়মকানুন ও উপকরণ তৈরি, বিদ্যালয় ভিত্তিক উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পে শিশুদের স্বাধীনতা ও অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার, যাতে শিশুরাই পরিকল্পনা করতে পারে।

## ড) বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার পরিচালনা ও ব্যবহারঃ

বিদ্যালয় ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে শিশুদের উপর। পাঠভিত্তিক পুস্তক বাছাই করতে হবে শিক্ষকের দায়িত্বে। পরে সেগুলিকে শিশুরা সাজিয়ে রাখবে সঠিকভাবে। সপ্তাহে অন্তত একবার একটি বা দুটি পিরিয়ডে আলোচ্য বিষয়ভিত্তিক পুস্তকগুলিকে নামিয়ে এনে দলগতভাবে পড়তে পারে এবং আলোচনা করতে পারে। অন্যদিকে তারাই কোনও বই কয়েকদিনের জন্য বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারে। তারজন্য শ্রেণিকক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট ইস্যু খাতা রক্ষা করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত কৃত্যালিগুলিকে প্রতিদিন পরিচালনা করতে গেলে নীচের তিনটি বিষয়ে নজর রাখতে হবে।

- শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক সামগ্রী ভাণ্ডার

সম্ভাব্য গান, নাটক, চরিত্রাভিনয়কে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে একটি 'সামগ্রী ভাণ্ডার' তৈরি করতে হবে। নাটকের জন্য দৃশ্যপট তৈরির সরঞ্জাম, হাতের কাজের জন্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল, গানের জন্য ঘুঙুর, ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র, ছড়া লেখার জন্য ছন্দবদ্ধ শব্দের কার্ড আগে থেকেই তৈরি করে মজুত রাখতে হবে। এরজন্য শ্রেণিকক্ষের মধ্যে একটি কর্ণার তৈরি করতে হবে। গ্রন্থাগারে পাঠভিত্তিক বইপত্রের যোগান রাখতে হবে। এছাড়া সংগ্রহশালা করার জন্য নির্দিষ্ট আসবাবপত্র মজুত রাখা দরকার।

- সংশ্লিষ্ট শব্দচর্চা

যে কোনও মাধ্যমকেই ব্যবহার করা হোক না কেন, শিক্ষকদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে আলোচ্য বিষয়ের অনুসারী সংশ্লিষ্ট শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব শিশুরা ব্যবহার করতে পারে। স্থানীয় ও কথ্য শব্দ ব্যবহার হলেও তাকে মান্য ভাষায় দ্রুত রূপান্তরিত করতে হবে সৃজনমূলক কৃত্যালির মধ্যে দিয়েই। পরে শিশুদের সঙ্গে আলোচনার সময় শব্দগুলির অর্থ বা তার প্রয়োগ নিয়ে শিক্ষককে কিছুক্ষণ কাটাতে হবে।

- স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার

যে সমস্ত মানুষেরা এলাকায় এই সমস্ত সৃজনমূলক কাজে দক্ষ, তাদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করে শিশুদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। ভাল লোকশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, হস্তশিল্পী, গল্প বলিয়ে, নাট্যকর্মী, খেলোয়াড়, ক্যুইজ মাস্টারকে ডেকে এনে বিদ্যালয়ের কৃত্যালিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়। এলাকায় প্রচলিত গান, নাচ, নাটক, যাত্রাপালা, কেষ্টযাত্রা, শীতলামঙ্গল, পীরের গান, ফকিরী গান নিয়ে এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুললে শিশুর শিক্ষা অনেক প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক হতে পারবে।

## ৪) দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের ব্যবহার

শিশুরা নতুন কিছু প্রযুক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি। উপরন্তু সেই প্রযুক্তিতে যদি দৃশ্য ও শ্রাব্যের ব্যবস্থা থাকে তবে তা তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের নবতম সংযোজন হল কম্পিউটার। এই মাধ্যমটি

ব্যবহার করে এখন বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানের সম্ভার হাতের কাছে আনা যায়। ফলে এই মাধ্যমটি ব্যবহার করে শিশুর শিখনকে আরও দৃঢ় করা এখন অবশ্য কর্তব্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক করতে এই মাধ্যমের ভূমিকা কোথায় আছে?

প্রথমত, আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে এলাকার 'স্থানীয় জ্ঞান' থেকে শিশুর পাঠ শুরু হবে তাই যে কোনও দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপকে শিশুর জানা জগৎ দিয়ে শুরু করে অজানা জগতের তথ্য, সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ ভাবনার ইঙ্গিতবাহী করে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মোবাইল বা ক্যামেরায় তোলা ছবি, গুগুল, ইন্টারনেট ও পাওয়ার পয়েন্ট সহ নানান প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে শিক্ষক যে কোনও বিষয়কে অনেক বেশি আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারেন।

তৃতীয়ত, সরাসরি পুরো ইউনিটটা না দেখিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী থামিয়ে থামিয়ে এবং শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে গেলে শিশুর পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি পেতে পারে।

চতুর্থত, এই ভিডিও ক্লীপগুলি পাঠ্যাংশের অভ্যন্তরে নিহিত ভাবনাগুলির ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে। এবং ওই বিষয়ের উপযুক্ত সংশ্লিষ্ট শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে ব্যবহার করতে হবে উপযুক্ত জায়গায়। নেপথ্যকণ্ঠ দেওয়ার সময় এবং পাওয়ার পয়েন্টে বিষয়ভিত্তিক কথা দেখানোর সময় এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করতে হবে। ক্লীপটি দেখার পর শিশুরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে এবং বিষয়টির মূল কথাগুলি তারা তাদের নোটবুকে দু'এক কথায় লিখে রাখবে।

তাই পাঠ্য বইয়ের কোনও অধ্যায় শুরু হওয়ার আগেই শিক্ষক এবিষয়ে দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপের ব্যবহার কোথায় কোথায় হতে পারে তা নিয়ে পরিকল্পনা করে নেবেন এবং পাঠটি শুরু করার আগেই ওই ক্লীপগুলি তৈরি করে রাখবেন। এছাড়া রেডিও, টেপ রেকর্ডার, স্লাইড-শোর সরঞ্জাম, মোবাইল ব্যবহার করে এই বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করা যায়।

এককথায় পাঠ্যবই থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রথাগত পদ্ধতির মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক শিক্ষাকে স্থান দিতে হলে পঠন-পাঠনের কৃৎকৌশলের মধ্যে উপরের চারটি ক্ষেত্রকে প্রয়োগ করার উদ্যম ও উদ্যোগ রাখতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই জরুরি কর্তব্যটিকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করবে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার গুণগত মানের পরিস্থিতি কেমন হবে।

# চেনা ছকে অচেনা কথা

## কাঙ্খিত সামর্থ্য ও মূল্যবোধের নতুন তরজমা

'কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য ও মূল্যবোধের বিকাশ' এই কথাটি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি পুরনো এবং বহুল ব্যবহৃত শব্দবন্ধ। ১৯৭৮/৭৯ সাল থেকে 'ন্যূনতম সামর্থ্য' (Minimum competency) এই শব্দবন্ধটিকে বর্জন করে আমরা 'কাঙ্খিত সামর্থ্য' (Desired competency) ব্যবহার করছি। পাশ-ফেল প্রথা তোলা আর সার্বিক ও নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের সূচনার সঙ্গে এটি সম্পর্কযুক্ত। অধ্যাপক হিমাংশু বিমল মজুমদারের নেতৃত্বে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এই ভাবনাটিকে মেনে নিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয়স্তরে NCF 2005, নথিটিতে একইভাবে কাঙ্খিত সামর্থ্যের বিষয়টি গৃহীত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা উঠে যায় এবং মূল্যায়নের মধ্যে শিশুর কাঙ্খিত সামর্থ্যের বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়। একই ধারা অনুসরণ করে আজকের দিন পর্যন্ত তাই পাঠ্যসূচির অভ্যন্তরে 'কাঙ্খিত সামর্থ্যে'র খোঁজ বলবৎ রয়েছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ শ্রেণিভিত্তিক কাঙ্খিত সামর্থ্যের একটি তালিকা দিয়েছেন। ওখানে শ্রেণির জন্য যা বলা আছে তা হলঃ

## ১। কাঙ্খিত সামর্থ্য

## [পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুসারে তৃতীয় শ্রেণির জন্য]

শোনাঃ ছড়া, ধাঁধা, গল্প, কবিতা, মনীষীদের জীবন কথা, অপরিচিত পরিবেশের নানান কথা যেমন, খবর, ঘটনার বর্ণনা ইত্যাদি।

দেখাঃ যুক্তাক্ষর, যতিচিহ্ন ইত্যাদি, ছবি-স্থিরচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি, নাটক, পুতুলনাচ ইত্যাদি, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

বলাবলিঃ ছড়া, ধাঁধাঁ, কবিতা, গল্প ইত্যাদি, মনীষীদের জীবন কথা, অপরিচিত পরিবেশে নানান কথা, কোনও কিছু বুঝে অন্যদের বোঝানো, প্রশ্ন তৈরি করা, উত্তর দেওয়া, পক্ষে বিপক্ষে কথা বলা, ক্যুইজ, সংলাপ।

পড়াঃ স্পষ্ট উচ্চারণে পড়া-যতিচিহ্নের বোধসহ, সরব পাঠ, নীরব পাঠ সহ বুঝে উত্তর দেওয়া, বাইরের পাঠ (কবিতা, ছড়া, গল্প, বর্ণনা ইত্যাদি) পড়া, খবর পড়া ও বোঝা এবং বলতে পারা।

লেখাঃ শব্দ, বাক্য-দেখে, শুনে, নিজের থেকে এবং নির্দেশিত বিষয়ে শ্রুতলিখন, জানা ও অজানা বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর লেখা (ছোট/মাঝারি-জ্ঞান/বোধমূলক), নির্ভুলভাবে বর্ণ শব্দ বাক্য ইত্যাদি গল্প শুনে/পড়ে-ছবি দেখে নাটক দেখে ঘটনা দেখে/ শুনে কথায় কিছু লেখা।

বোধ ও প্রয়োগঃ শিক্ষার্থীর দেখা, শোনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষজাত অভিজ্ঞতা থেকে একক ও সমবেতভাবে জ্ঞান গঠন করবে এবং জ্ঞান ও বোধের স্তর পেড়িয়ে লব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে শিখবে। এইভাবে তার সংশ্লেষণী ক্ষমতারও প্রসার ঘটবে। সাধারণ বোধের চর্চার মাধ্যমে পরিপার্শ্ব ও পরিস্থিতিকে অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাও তৈরি হবে।

## তৃতীয় শ্রেণির সামর্থ্যক্রমে বিভাজন

শোনা, বোঝা, বলা, পড়া, লেখা, দলগত কাজ, সৃজনমূলক কাজ, উদ্ভাবনী চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ, পার্থক্যীকরণ, ব্যাখ্যাকরণ ও নামকরণ, অনুমান করার ক্ষমতা, চিহ্নিতকরণ ও নামকরণ, পঞ্জীকরণ, তুলনা এবং বৈপরীত্য সম্পর্কে ধারণা ব্যবহার করার ক্ষমতা, সংগ্রহ, বর্ণনা, শ্রেণিকক্ষে পরীক্ষা–নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ, মডেল তৈরি করা, ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশের ক্ষমতা, নথিভুক্তিকরণ, চরিত্রায়ন, কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় ইত্যাদি।

## চতুর্থ শ্রেণির সামর্থ্যক্রমে বিভাজন

পড়া, লেখা, শোনা, বোঝা, বলা, দলগত কাজ, সৃজনমূলক কাজ, সাধারণীকরণ, উদ্ভাবনী চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পার্থক্যীকরণ, ব্যাখ্যাকরণ ও নামকরণ, অনুমান করার ক্ষমতা, চিহ্নিতকরণ ও নামকরণ, পঞ্জীকরণ, তুলনা এবং বৈপরীত্য সম্পর্কে ধারণা ব্যবহার করার ক্ষমতা, সংগ্রহ, নিজের মতামতের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা, বর্ণনা, শ্রেণিকরণ, পরীক্ষা–নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, মডেল তৈরি করা, ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশের ক্ষমতা, নথিভুক্তিকরণ, চরিত্রায়ন, কার্যকারণবোধ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, বানানবিধি সম্পর্কে পরিচিতি।

# কাঙ্খিত সামর্থ্য [পঞ্চম শ্রেণির জন্য]

## মৌখিক (বলা ও পড়া)

- সুস্পষ্ট সুন্দর পাঠ করতে পারা।
- পাঠ্য যে কোনও বিষয়ে, পাঠ-বহির্ভূত যে কোনও বিষয়ে নোটিশ, প্রচারপত্র ইত্যাদি।
- আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারা।
- জানা বিষয়ে সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারা।
- কথার যুক্তি প্রয়োগ করতে পারা।
- বলা ও বোঝানোর সময় মান্য ভাষা প্রয়োগ করতে পারা। স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কৌশলে বা ভঙ্গীতে বা রীতিতে বলতে পারা।
- মুখে মুখে প্রশ্ন তৈরি করতে পারা।
- শিল্পকর্ম, খেলাধুলো সহ সৃজনাত্বক কাজগুলির করণ-কৌশল, প্রয়োজন ইত্যাদি বুঝিয়ে বলতে পারা।
- সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা যথাযথ ভাব অনুসারে পড়তে পারা।
- লোককথা, রূপকথা, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির নানান সম্পদ গুছিয়ে বলতে পারা।
- অভিনয় দেখে ও বুঝে সে সম্পর্কে বলতে পারা।
- চার্ট, মানচিত্র, মানসচিত্র দেখিয়ে সেই সম্পর্কে বলতে পারা।
- অপরিচিত পরিবেশে কথাবার্তা বলতে পারা।
- বিতর্কে অংশ নিতে পারা।
- খবর শুনে বা দেখে মন্তব্য করতে পারা।

## লিখিত (লেখা)

- জানা বিষয়ে স্বচ্ছভাবে লিখতে পারা।
- খবর, বক্তব্য, বিতর্ক সহ অজানা অপরিচিত বিষয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও অংশ লিখে রাখতে পারা।
- প্রশ্ন তৈরি করে (জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতাধর্মী) নিজেরাই তার উত্তর লিখতে পারা।
- লেখায় মান্য ভাষা যথাযথ ব্যবহার করতে পারা।
- ডায়েরি বা দিনলিপি রাখতে পারা।
- ছোট ছোট পত্র (চিঠি), বিজ্ঞপ্তি প্রচারপত্র ইত্যাদি লিখতে পারা।

- হাতে লেখা পত্রিকা তৈরি করতে পারা।
- যতিচিহ্নের প্রয়োগ সহ শ্রুতলিখন নিতে পারা।
- সম্পর্কে ছোট ছোট প্রতিবেদন তৈরি করতে পারা।
- প্রতি পর্বে অন্তত একটি করে প্রদর্শনী করে তার লিখিত বিবরণ দিতে পারা।
- কল্পনা করে লিখতে পারা। বিষয়ানুসারে কিছু লেখা অনুবাদ করতে পারা।
- বাক্যের অন্তর্গতপদ সম্পর্কে বুঝে সেগুলি যথাযথ ব্যবহার করতে পারা।
- শব্দকোষ তৈরি করতে পারা (অভিধানের সাহায্যে) বোধ ও প্রয়োগ

শিক্ষার্থী দেখা, শোনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষজাত অভিজ্ঞতা থেকে একক ও সমবেতভাবে জ্ঞান গঠন করবে এবং জ্ঞান ও বোধের স্তর পেরিয়ে লব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করতেও শিখবে। এইভাবে তার সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী ক্ষমতারও প্রসার ঘটবে। সাধারণ বোধের চর্চার মাধ্যমে পরিপার্শ্ব ও পরিস্থিতিকে অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাও তৈরি হবে।

গত কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্দেশিত কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্যের এই তালিকা কমবেশি একই রকম আছে। প্রচলিত শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠনের ধারা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, উপরের তিনটি সামর্থ্যের মধ্যে একমাত্র 'শোনা' 'পড়া' ও 'লেখা'-এই তিনটি সামর্থ্যের উপর শ্রেণিকক্ষের মূল সাফল্য নির্ভর করে। সমস্ত কাজ পাঠ্য বইয়ের পাঠগুলিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। বিশেষ করে 'লেখা'র কাজটিকে অভীষ্ট সামর্থ্য বলে মান্য করাও হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য যে ভিন্ন তা বোঝা যায় পরবর্তীতে উল্লেখিত একটি অংশ থেকে যেখানে স্পষ্ট বলা আছে শিক্ষক-শিক্ষিকা যে যে বিষয়ে যত্নবান হবেনঃ

## শিক্ষক-শিক্ষিকা যে যে বিষয়ে যত্নবান হবেনঃ

- আকর্ষণীয় গল্প বলুন, শিক্ষার্থীকে গল্প বলতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি করুন।
- সৃজনাত্মক কাজে উৎসাহ দিন।
- উৎসব, ভ্রমণ, মেলা, প্রদর্শনী দেখতে উৎসাহ দিন। সে বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান ঘটতে দিন।
- খেলাধূলা, আবৃত্তি, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, গল্প বলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন।
- নিজে লিখে বা সংগ্রহ করে তাদের উপযোগী কবিতা-গল্প পড়তে দিন যাতে শিখন প্রক্রিয়াটি প্রাণময় ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও তার ইতিবাচক স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি দিন।
- প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিন।
- কথা বলার প্রবণতাকে উৎসাহ দিন।
- শিক্ষার্থীর মৌলিক লেখার প্রতি গুরুত্ব দিন।
- কোথাও বেড়াতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে কয়েকটি বাক্য স্বাধীনভাবে লেখা, পড়া বা শোনা গল্পকে বড় বা ছোট করে বলা বা লেখা অভ্যাস করান।
- শিশুদের উপযোগী পত্রিকা পড়তে দিন।
- লক্ষ্য রাখুন যাতে তারা উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার শেখে, বানান যাতে শুদ্ধ হয়, উচ্চারণ যাতে যথাযথ

ও স্পষ্ট হয়, ছেদ ও যতিসহ পড়তে পারে, সৃজনশীল কাজে উৎসাহ পায়, সংযুক্ত বর্ণের পরিচিতি ও উচ্চারণ সম্পর্কে দক্ষ হয় এবং হাতের লেখা যাতে স্পষ্ট হয়।

- অবশ্যই শ্রুতলিখন অভ্যাস করাবেন। সঙ্গে রচনার ভাব সমন্বিত ছবি আঁকতে দিন।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি নজর করলে বোঝা যায়, পর্ষদ যা বলতে চেয়েছেন তা হল পাঠভিত্তিক শ্রবণ, পঠন ও লিখনের বাইরে শিশুর মধ্যে অন্য আরও এমন কিছু সামর্থ্য আছে যা আপাতত পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার কর্মসূচির মধ্যে তেমনভাবে স্থান পায় না। শিশুর ব্যক্তিত্বকে পূর্ণাঙ্গভাবে রূপ দিতে তাই শিক্ষক-শিক্ষিকার দৃষ্টিভঙ্গী বদল করা যে কত জরুরি এথেকেই তা বোঝা যায়।

তাই পর্ষদের ভাবনাকে মাথায় রেখে চেনা সামর্থ্যগুলির নতুন তরজমা করার সময় এসে গেছে। বিকল্পের সন্ধানে নেমে তাই প্রচলিত প্রক্রিয়া ও ধারণার নবায়িত করা হয়েছে। নিম্নলিখিতভাবে আমরা বিষয়টা ভাবতে পারিঃ

## ১) প্রাসঙ্গিক শিক্ষার নিরিখে কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য ও মূল্যবোধ

গ্রহণ, প্রকাশন, চিন্তন ও অনুধাবন, রূপায়ণ ও প্রয়োগ

### প্রাসঙ্গিক শিক্ষার নিরিখে কাঙ্খিত সামর্থ্য ও মূল্যবোধঃ

| গ্রহণ (Receiving) | প্রকাশন (Expressing) | চিন্তন ও অনুধাবন (Thinking & understanding) | রূপায়ণ ও প্রয়োগ (Applying) |
|---|---|---|---|
| • যে কোনও শব্দ, কথা, গান খেয়াল করে শোনা (Listening)<br>• চেনা জগৎ-পরিবেশ-মনুষ্য সমাজে ঘটমান দৃশ্যগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা (Observing)<br>• লিখিত সংকেত/বার্তা পর্যবেক্ষণ ও নীরবে পাঠ (Silent Reading) করা<br>• ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও সংকেতকে স্বল্পমেয়াদী স্মৃতিতে (Short term memory) স্থান দেওয়া<br>• প্রাকৃতিক, লৌকিক ও যান্ত্রিক মাধ্যমে প্রাপ্ত নান্দনিক সংকেতগুলিকে গ্রহণ | • প্রকাশন (Expressing)<br>• নিজের ভাষায় প্রকাশ করা (Speaking)<br>• বলাবলি করতে পারা (Exchanging views)<br>• বার্তা বা সংকেত প্রদান করতে পারা (Communicating)<br>• লিখিত সংকেত/বার্তা সরবে পাঠ করতে পারা (Loud reading)<br>• অনুকরণ করতে পারা (Imitation)<br>• স্মৃতি থেকে অভিজ্ঞতা পুনঃসৃজন (Recreate) করতে পারা<br>• দৃশ্যমান জগৎ থেকে | • যুক্তি প্রয়োগ করতে পারা (Reasoning)<br>• বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারা<br>• ব্যতিক্রম নিরূপন করতে পারা<br>• কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারা<br>• সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপন করতে পারা<br>• সিদ্ধান্তে আসতে পারা<br>• সাধারণ সূত্র নির্মাণ করতে পারা<br>• পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপন করতে পারা<br>• সমস্যা চিহ্নত করতে পারা<br>• ঘটনার ক্রম চিহ্নিত করতে পারা | • নিজস্ব পদ্ধতিতে কথায় বা লেখায় যে কোনও সংকেত প্রকাশ করতে পারা (Expression)<br>• সমাধানসূত্র বের করতে পারা (Solving)<br>• নিজের বোধ ও উপলব্ধি নান্দনিক প্রক্রিয়ায় পরিবেশন করতে পারা (Aesthetic Presentation)<br>• শব্দ (Sound) থেকে ছন্দ পুনঃসৃজন করতে পারা<br>• সমজাতীয় বিমূর্ত ধারণা মূর্ত করে তুলতে পারা<br>• যে কোনও সমজাতীয় ভাবনাকে হাতের কাজে রূপদান করতে পারা<br>• সমজাতীয় সমস্যা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| করতে এবং সেগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারা (Earning experience) | ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সহজ ও নান্দনিক প্রকাশ গান, নাচ, বাদ্যযন্ত্র, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে)<br>• একইভাবে লিখিত সংকেত/বার্তা প্রয়োগ করে সহজ প্রকাশ (Self-writing and simple Arithmatics) | • সহজ থেকে জটিল চিন্তন ও বোধে যাওয়া<br>• কল্পনা করতে পারা<br>• বিমূর্ত ধারণাকে উপলব্ধি করতে পারা<br>• কোনও কিছু পুনরায় সৃজন করতে পারা<br>• প্রশ্ন করতে পারা<br>• অধিকতর নির্ভুলভাবে সংকেত পাঠ ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ করতে পারা<br>• লিখিত সংকেতের নীরব ও সরব পাঠোদ্ধার | নিজেই তৈরি করতে পারা (Problem-making)<br>• ওই সমস্যার সমাধান করতে পারা (Solving)<br>• প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক কার্যাবলীর পশ্চাতে থাকা কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে পারা এবং তার সহজ রূপদান করতে পারা। (Reasonin and system Analysis) |

## ২) মনে রাখতে হবে, শিশু নিজেই নিজের মধ্যে সামর্থ্য ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে

বাইরে থেকে কেউ ফরমাস মতো তা তৈরি করে পাঠাতে পারে না। শুধু শিশুর পরিবেশকে তার অনুকূলে গড়ে তোলাই হল আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের মূলকথা। এই পরিবেশ রচনার জন্য শ্রেণিকক্ষের মধ্যে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কয়েকটি শিশু মনস্তত্ত্ব সম্মত কৃৎকৌশল অবলম্বন করা দরকারঃ

## খ) শিক্ষকদের জন্য প্রস্তাবিত কৃৎকৌশল

- দলভিত্তিক শিখন চালু করবেন।
- দলের মধ্যে ভাল-মন্দ সব স্তরের শিশুদেরই রাখতে পারেন।
- পাঁচ/ছ'জনের শিশু নিয়ে দল গঠন করতে হবে। তারা শ্রেণিকক্ষে গোলাকারে দলে বসবে অথবা বর্হিবিদ্যালয় কৃত্যালিতেও দলগতভাবে অংশগ্রহণ করবে।
- প্রতিটি দলের জন্য প্রয়োজনে শিখন স্তর অনুযায়ী একাধিক স্তরে শিখন সামগ্রী মজুত রাখতে হবে।
- শিক্ষক-শিক্ষিকা চ্যালেঞ্জ আকারে কৃত্যালিগুলি দেবেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরা কর্মপরিকল্পনা করতে পারে। প্রথমে দলগতভাবে এবং পরে নিজে নিজে তা সমাধান করতে পারবে। এটি শিক্ষক নজর রাখবেন।
- প্রতিদিন একজন শিক্ষার্থী দলের দলনেতা হিসেবে কাজ করবে। দলনেতার নির্দেশ অনুসারে তারা নিজেরা দল পরিচালনার কিছু নিয়মকানুন নিজেরাই গণতান্ত্রিকভাবে তৈরি করবে।
- সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এমনকি সিদ্ধান্ত ভুল হলেও তাদেরকে যৌথ সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে।
- শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভারা বন্ধনের (Scaffolding) কাজটি করবেন ছোট ছোট সাহায্য, ইঙ্গিত, প্রশংসা করার মাধ্যমে এবং শিশুদের কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ দেবেন।

- শিক্ষক-শিক্ষিকা শুধু নজর রাখবেন দলটি তর্ক-বিতর্কের শেষে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিনা এবং সিদ্ধান্তটি কতটা আদর্শ উত্তরের কাছাকাছি যাচ্ছে। সাথে সাথে এও নজর রাখবেন যে, পিছিয়ে পড়া শিশুরা সবাই অংশগ্রহণ করছে কিনা এবং তারা অভীষ্ট ধারণা ও সামর্থ্যটিকে আত্মিকরণ করতে পেরেছে কিনা। না পারলে পুনরায় সহজতর বিকল্প কাজ দিয়ে তার সামর্থ্যকে বাড়াতে সাহায্য করতে হবে। শিশুদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত সম্পাদন যে স্তরেই থাকুক না কেন, শিক্ষক-শিক্ষিকা শিশুর প্রশংসা করবেন এবং আগামী দিনে একইভাবে সাহায্য করবেন। তাই প্রথম পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে একাধিক মানের কর্মসামগ্রী ও কর্মপত্র মজুত রাখতে হবে।

## ৩) পাঠ বিশ্লেষণ, ভাবমূল চিহ্নিতকরণ ও কৃত্যালি নির্বাচন প্রক্রিয়া

যে কোনও পাঠের ভাবমূলকে (Themes) কেন্দ্র করে কয়েকটি উপভাবমূলে (Sub-Themes) তা ভাগ করতে হবে। উপভাবমূলগুলিকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিম্নলিখিত কৃত্যালি নির্বাচন করতে পারেনঃ

ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত গল্প বলা বা বলানো।

খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও সহজ পাঠ, ছবি-ছড়া-গল্পের বই থাকলে তা স্ব-পঠনের জন্য দেওয়া। প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পুস্তক সম্বলিত গ্রন্থাগার গড়ে তোলা।

গ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্হিবিদ্যালয়ে কোনও কৃত্যালি গ্রহণ করার মতো পরিস্থিতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা থাকলে শিশুদের দল তৈরি করে তা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা, সমাজের মানুষদের সঙ্গে কথা বলা এবং সমীক্ষার বিবরণ পেশ করতে বলা।

ঘ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত অডিও-ভিস্যুয়াল ক্লীপ থাকলে তা শ্রেণিকক্ষে দেখানো এবং বিষয়টি অনুধাবন করতে সাহায্য করা।

ঙ) ওই বিষয়ে ছোট ছোট নাটিকার প্লট তৈরি করে শিশুদের বুঝিয়ে দেওয়া, যাতে তারা তাদের ইচ্ছে মতো সংলাপ তৈরি করে নাটিকাটি উপস্থাপন করতে পারে।

চ) ওই বিষয়ে ছড়া বানানো, গান তৈরি করা, মডেল তৈরি করা, ছবি আঁকা, পরিবেশভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, জনকল্যাণকর সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া, পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, সামাজিক ক্রীড়া ও যোগ প্রদর্শন অনুষ্ঠান করা ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করানো।

ছ) ওই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট 'ভাষা ভাণ্ডার ও শব্দজাল নির্মাণ' ও মানস মানচিত্রের চর্চার মাধ্যমে শব্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক ভাব ঐক্য আবিষ্কার করানো।

জ) ওই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শব্দ ও শব্দগুচ্ছের প্রয়োগের মাধ্যমে সহজ থেকে সহজতর নানা সুখকর পাঠ নির্মাণ করা এবং শিশুর মান অনুসারে তা স্ব-পঠনের জন্য দেওয়া।

ঝ) সংশ্লিষ্ট শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে প্রতিটি কৃত্যালিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা। কথা বলার দক্ষতার সঙ্গে এই শব্দগুলি ব্যবহারে সাবলীল করে তোলা। এমনকি, দু-এক কথায় বিবরণ লেখার ক্ষেত্রেও যাতে তারা ওই শব্দগুলি ব্যবহার করতে পারে তাও চেষ্টা করা দরকার।

ঞ) সর্বক্ষেত্রে শিশুকে প্রশংসা করবেন এবং আগামী দিনে এইভাবে এগোতে সাহায্য করবেন।

## ৪) শিখন সামগ্রী (TLM) ব্যবহার

প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি করে নোটবুক রাখতে হবে। এই নোটবুকে তারা প্রাপ্ত জ্ঞান ও ধারণাগুলিকে উপযুক্ত শব্দে দু-এক কথায় লিখে রাখবে।

এছাড়া দলভিত্তিক এক একটি বিগবুকও রাখতে হবে। এগুলি খানিকটা প্র্যাক্টিক্যাল খাতার মতো। ওখানে ওরা পাট ভিত্তিক প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন, ছবি, সংগৃহীত পাতা, উপযুক্ত শব্দ, পাঠের মূলকথা ও গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা লিখে রাখতে

পারে। ছবি আঁকার জন্য রং পেন্সিল, সমীক্ষার জন্য বড় বড় হরফের ফর্ম, সহজপাঠ বা সহজতর পাঠ সমন্বিত পঠন কার্ড, ছবি ও গল্পের বই, ছড়া ও গল্পের কার্ড, মানস মানচিত্রে উঠে আসা শব্দতালিকা এবং পাঠ্যবইয়ে ব্যবহৃত দুরূহ ও প্রাসঙ্গিক শব্দের কার্ড তৈরি করে রাখতে হবে। প্রয়োজনে সেগুলি দেখিয়ে আলোচনার পরিসর তৈরি করবেন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

## ৫) শিশুদের মধ্য গণতান্ত্রিক এবং স্বায়ত্বশাসনের বাতাবরণ বজায় রাখা

শিশুদের মধ্যে সঠিকভাবে দল গঠন ও স্বেচ্ছায় পরিচালনা হলে প্রতিটি দলেই গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসনের অভ্যাসগুলি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। তবে এক্ষেত্রে শিশুর সুখ ও আনন্দবোধের সঙ্গে সমস্ত কৃত্যালিকে সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে চারটি মূল কৃত্যালির মধ্যে কোনটি দিয়ে তারা ওই মূহুর্তে কাজ করতে চাইছে তা জেনে পাঠ শুরু করলে শিশুদের পছন্দকে সম্মান জানানো যাবে। এটি শিশুদের আরও গভীরভাবে পাঠে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে। কৃত্যালিগুলি যেহেতু সরাসরি পাঠের সঙ্গে যুক্ত নয়; তাই এগুলির সার্থকতা শুধুমাত্র উপযুক্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব। পারা না পারা, পাশ-ফেল, না পারলে বকুনি, চাপ বা ভয় এসবের প্রশ্ন এখানে নেই। সবাই আনন্দ আর মজার সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে এটাই কাম্য।

## ৬) বিদ্যালয় পরিচালনায় যোগচর্চা এবং শিশুদের কুশলতা বোধ (Well-being)

বিদ্যালয়ের শুরু থেকে যত রকমের কৃত্যালি [প্রার্থনা, সারি দিয়ে দাঁড়ানো, মহাপুরুষদের বাণী শোনা, পরিছন্নতা, আজকের দিনের বড় খবর পাঠ বা শোনানো, শৃঙ্খলা মেনে দিন শুরু করা, ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সময় কাটানো, টিফিন করে বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো, শ্রেণিকক্ষের বাইরে ও ভেতরে রুটিন অনুযায়ী কৃত্যালি, খেলাধূলা, হাতের কাজ ইত্যাদি] আছে, সেখানে কীভাবে যোগচর্চাকে সঠিকভাবে স্থান দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা খুব জরুরি। মৃদু সংগীতের সাথে যোগাসনের নানা সহজ ফর্মূলা শিশুদের মধ্যে শক্তি আনতে, মনোযোগ বৃদ্ধি করতে এবং সুখবোধ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে অবসরটুকুতেও শিশুরা কী ধরনের অভ্যাস করতে পারে তার চর্চা হওয়া দরকার। শিশুকে ক্লান্তি ও একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত করতে এবং পরবর্তী ক্লাসের জন্য আরও ভাল করে প্রস্তুত করে তুলতে যোগ ব্যায়াম একটি গঠনমূলক উদ্যোগ। তাছাড়াও রাগ, ঈর্ষা, ভয় থেকেও তাকে মুক্ত করতে পারে এই যোগচর্চা।

## ৭) মূল্যবোধের বিকাশই হল লক্ষ্য

বিদ্যালয়স্তরে যা কিছু করা হয়ে থাকে তার পেছনে শিশুদের মধ্যে কয়েকটা মূল্যবোধ গড়ে তোলাই হল মূল উদ্দেশ্য। অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর নয়া উদ্যোগে যে চারটি ক্ষেত্র আছে সেখানে কৃত্যালিগুলির পরিচালনা করার ফলে শিশুর মধ্যে নিম্নলিখিত মূল্যবোধগুলি জাগ্রত হয়। শিশুর হৃদয়ে এই মূল্যবোধগুলির সংশ্লেষণের ফলে শিশুর মধ্যে এক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, এটাই শেষ পর্যন্ত তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্যের সঙ্গে জীবনযাপন করতে অনুপ্রেরণা দেয়।

### কাঙ্খিত মূল্যবোধগুলি হলঃ

ক) সহপাঠী ও সমাজের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা গড়ে উঠবে।

খ) দল বেঁধে কাজ করার ইচ্ছা প্রবল হবে।

গ) নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে দমন করে বেশিরভাগের ইচ্ছাকে মান্যতা দেওয়া অভ্যাসে পরিণত হবে।

ঘ) পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা প্রবল হবে এবং তাকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হবে।

ঙ) সামাজিক শুভকাজ ও সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর অভ্যেস গড়ে উঠবে এবং নিজে যে খারাপ কিছু করতে বা

ভাবতে পারে না সে ব্যাপারে নিজের উপর শ্রদ্ধাবোধ তৈরি  হবে।

চ) যুক্তিবোধের উপর নির্ভরশীলতার বিকাশ ঘটবে।

ছ) নিজেকে দ্বিধা সংকটের মধ্যে স্থাপন করেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

জ) নিজের মধ্যে রাগ, ঈর্ষা ও ভয় বোধকে বুঝতে পারবে এবং তার থেকে মুক্তির জন্য গান করা, ছবি আঁকা, নাটক করা, অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলা এবং যোগব্যায়াম করার চেষ্টা করবে।

ঝ) কতকগুলি মুখ্য মূল্যবোধের দ্বারা শিশু পরিচালিত হবে যেমন, সততা, মিথ্যা কথা না বলা, অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, সুন্দর বিষয়কে প্রশংসা করা, আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত ও সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া, অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু হওয়া, অন্যের কষ্টে দুঃখী হওয়া, অন্যের ভাল ও আনন্দকে নিজের আনন্দ বলে অনুভব করা, পরিবারে ও সমাজে বড়দের শ্রদ্ধা করা ও মান্যতা দেখানো।

ঞ) আশাবাদে বিশ্বাসী হবে এবং ব্যর্থতাকে মুছে ফেলারও চেষ্টা করবে। নিজের মধ্যে যেটুকু ক্ষমতা আছে তাতেই বিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

ট) দেশের ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রতি গৌরববোধ গড়ে উঠবে।

ঠ) কল্পনা প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। সৃজনশীল মানুষদের কাজকে সন্মান জানাতে পারবে।

ড) যে কোনও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ বাড়বে।

ঢ) মনীষী ও পথদ্রষ্টাদের দ্বারা উৎসাহিত হবে।

ণ) সব কাজে উদ্যম ও উৎসাহবোধ করবে।

প) অতীত গৌরব সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জন্মাবে।

ফ) আত্মত্যাগ ও নিস্বার্থ কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে।

# তটরেখা সমীক্ষাঃ শিক্ষকদের জন্য

এই প্রকল্পের শুরুতে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি তটরেখা সমীক্ষা করে নেবেন। সমীক্ষাটি হবে পঞ্চমুখী।

- গ্রহণ (Receiving) ও অনুধাবন দক্ষতার সমীক্ষা।
- প্রকাশন (Communicating) ও অনুধাবন দক্ষতার সমীক্ষা।
- চিন্তন (Thinking) ও অনুধাবন দক্ষতার সমীক্ষা।
- রূপায়ণ  ও প্রয়োগ দক্ষতার সমীক্ষা।
- সুপ্ত মূল্যবোধের সমীক্ষা।

## ১) সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষকমণ্ডলী ‘গ্রহণ ও অনুধাবন দক্ষতার সমীক্ষা’র জন্য একাধিক হাতিয়ার ও পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেনঃ

ক) সহজ পঠন ও  অনুধাবন সমীক্ষাঃ- সহজ ভাষায় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের যে ন্যূনতম সামর্থ্যের স্তর আছে, এখানে তার মান্যতা দেওয়া হয়েছে। তা হলঃ

১) শিশু এক মিনিটে অন্তত ৯০ থেকে ১১০টি শব্দ যতিচিহ্ন সহযোগে নীরবে পড়তে সক্ষম হবে।

২) পাঠ্যাংশ থেকে দু-একটি মাল্টিপল ধরনের প্রশ্ন করলে তার সদুত্তর পাওয়া যাবে।

### একটি এক মিনিটের পাঠ্যাংশ দেওয়া হলঃ

নদীটির নাম ভৈরবী। গানের সুরের মতই তার আওয়াজ। এঁকেবেঁকে চলেছে গ্রামের পাশ দিয়েই। ঠিক ছবির মতো। দু'ধারে ঘন ঝোপ। ওখানে শরতে কাশ ফোটে।  গ্রামের কাছটিতে একটা প্রশস্ত ঘাট। গোটা কতেক বট আর অশ্বত্থ গাছ। অনেকটা জুড়ে ঘন ছায়া। তারি নীচে মহাকাল বাবার মন্দির। পাশে পীরের থান। চৈত্রের শেষে ওখানে মেলা হয়। ভিন গাঁ থেকে ছেলেমেয়ে বউ-ঝিরা মেলায় আসে। হিন্দুরা আসে, মুসলমানরা আসে। তখন নদীতে নিয়মিত ফেরি। মানত করে শিবের থানে, পীরের থানে। ঢাক বাজে, কাঁসর বাজে। পীরের মাজারে চাদর চাপায়। সন্ন্যাসীরা নানান শারীরিক কসরত দেখায়। বাংলা বছর শেষ হয়ে আসে। (শব্দ সংখ্যা ৯০)

- সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও।

ক) আসলে ভৈরবী কী?

- একজন মানুষের নাম
- একটা গানের সুর বা রাগ
- একটা বাদ্যযন্ত্র

খ) মহাকাল বাবার মন্দির হল

- শিবের মন্দির
- কালী মন্দির
- হনুমানের মন্দির

গ) নদীর ঘাটটি হল

- ছোট
- বেশ বড়
- সংকীর্ণ

ঘ) মন্দিরের পাশে

- ঘরদোর আর জঙ্গল
- পীরের মাজার
- কোনোটিই নয়

ঙ)'কসরত' কথাটির অর্থ

- শক্তি
- কৌশল বা খেলা
- অঙ্গভঙ্গী

এই ধরনের অনুধাবন পরীক্ষার জন্য একাধিক পাঠ্যাংশ এবং প্রশ্ন তৈরি করে কাজে নামতে হবে। সবগুলিতে মানের তারতম্য রাখতে হবে। যেটিকে উদাহরণ হিসেবে উপরে দেওয়া হল সেটিকে আদর্শ ধরে নিলে এরচেয়ে আরও তিনটি 'সহজতর' পাঠ তৈরি করতে হবে। কোনও শিশু আদর্শপাঠ পড়ে বুঝতে না পারলে তাকে সহজ বা সহজতর পাঠ দিতে হবে। এইভাবে তাদের মান চিহ্নিত করে শিশুদের তালিকা তৈরি করতে হবে। খেয়াল করতে হবে এখানে সে 'ভিন গাঁ', 'মাজার', 'কসরত' -এর মতো শব্দের মানে বুঝতে পারছে কিনা এবং 'অশ্বত্থ', 'ভৈরবী', 'সন্ন্যাসী', 'শারীরিক'-এর মতো শব্দগুলি সাবলীলভাবে পড়তে পারছে কিনা। এখানে শিশুদেরকে চারটি ভাগে ভাগ করতে হবে তাদের মান অনুসারে।

### খ) সরল শ্রবণ ও অনুধাবন সমীক্ষাঃ

শিক্ষক-শিক্ষিকা কোনও গল্প পরিবেশন করতে পারেন। তারপর ওই গল্প থেকে কে, কী, কাকে, কোথায়, কীভাবে এই জাতীয় প্রশ্ন করে গল্পের খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নেওয়া যেতে পারে। 'কেন' জাতীয় প্রশ্ন চিন্তন সমীক্ষার মধ্যে রাখা যেতে পারে। অন্যদিকে আবার কোনও ছড়া বা গান শুনিয়েও এসম্পর্কে সহজ প্রশ্নের মাধ্যমে এই সমীক্ষা করা যেতে পারে। এখানে মান অনুসারে শিশুদের চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

### গ) সংকেতধর্মী বিষয়কে অনুধাবনের সমীক্ষাঃ

কোনও মূকাভিনয়, হরবোলা, নৃত্য, ছবি বা ধাঁধাঁ দেখে বা শুনে শিক্ষার্থী কতটা ঘটনাক্রম বুঝতে পারছে তারও সমীক্ষা করা যায়। শিশুদের মান অনুসারে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

## ২) 'প্রকাশন ও অনুধাবন দক্ষতা' সমীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সূত্রগুলি প্রয়োগ করতে পারেনঃ

ক) বাচন সমর্থ্যঃ এমন একটি ছবি শিশুর কাছে তুলে ধরতে হবে যেখানে গল্প বলার সুযোগ আছে। শিশুকে এক মিনিট অনর্গল কথা বলতে দিতে হবে। কথা বলার মান অনুসারে শিশুদেরকে অন্তত চারটি ভাগে ভাগ করতে হবে।

খ) প্রকাশন ক্ষমতার সমীক্ষাঃ শিশুরা কে কী পারে এই নিয়ে একটা আসর বসিয়ে শিশুদের প্রকাশ করার ক্ষমতা

পরিমাপ করা যায়। সেখানে শিশুরা নিজেদের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকা, গান, মূকাভিনয়, মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি, কাগজ কেটে জিনিস বানানো, ছড়া লিখতে পারা, গল্প বলা, গল্প বানানো, সরল কথায় গল্প লেখা, বাদ্যযন্ত্র বানানো ইত্যাদির ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়। এখানেও শিশুদের মান অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করতে হবে।

### গ) দু-এককথায় লিখে প্রকাশের ক্ষমতাঃ

এমন একটা ছবি দেওয়া যেতে পারে যেখানে একটা বার্তা আছে। ওই বার্তাটিকে দু-এক কথায় লিখতে বলা যেতে পারে। ধরুন, একটি শিশু উল্টো গেঞ্জি পড়েছে বলে দেখা যাচ্ছে ছবিতে। এবার শিশুকে মন্তব্য লিখতে বলা হল। এখানেও মান অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করতে হবে শিশুদের।

### ঘ) বলাবলির ক্ষমতাঃ

একাধিক শিশুর পরিচিত কোনও এক বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করতে দেওয়া হল। ধরুন, গত কয়েক মাস 'করোনা' আক্রমণের জন্য শিশুরা গৃহবন্দি ছিল। তাদের কেমন লেগেছিল ওই সময়ে। দেখা যেতে পারে কোনও কোনও শিশু বলাবলিতে স্বচ্ছন্দ্য। তাদের মান অনুসারে এখানেও চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

### ঙ) অনুকরণ করার ক্ষমতাঃ

একটা যোগাসন দেখিয়ে দিয়ে শিশুকে বলা যেতে পারে তা অনুকরণ করতে। পাখির ডাক, মায়ের আচরণ, দাদুর স্বভাবও অনুকরণ করে দেখাতে বলা যেতে পারে। এই ক্ষমতা সমীক্ষার পর মান অনুসারে এখানেও চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে শিশুদের।

## ৩) 'চিন্তন ও অনুধাবন দক্ষতা'র সমীক্ষার জন্য নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়।

### ক) যুক্তিবিচার ক্ষমতাঃ

এমন একটা ছবি দেবেন যাতে কোনও একটি জটিল প্যাটার্ন রয়েছে। ওই প্যাটার্ন থেকে সহজ কিছু খুঁজে বের করতে দিতে হবে। যেমন অনেকগুলি পাখির দৃশ্যের মধ্যে একটা পাখিতেই কিছুটা তফাৎ আছে অথবা অনেকগুলি মুখের ছবির মধ্যে একটা ছবিতেই কিছুটা ভিন্নতা আছে। আপনি বলবেন যে, পাখিটা বা মুখটা অন্যদের সঙ্গে মেলে না তা বাদ দাও। এইরকম সমীক্ষার শেষে শিশুদের মধ্যে মান অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করা হবে।

### খ) সরব পাঠঃ

একটি সহজ পাঠাংশকে সরব পাঠের জন্য দেওয়া যেতে পারে। এখানে দেখতে হবে যতিচিহ্ন ও বিরাম চিহ্ন সঠিকভাবে ব্যবহার করে শব্দগুলি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কিনা। অন্তত মিনিটে ৯০টি শব্দ পড়তে পারছে কিনা তা দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে নীরব পাঠের জন্য দেওয়া পাঠের মতো আর একটি পাঠ দিয়ে তার সমীক্ষা করতে হবে। এখানেও শিশুদের মান অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করতে হবে।

### গ) 'কেন' প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার সমীক্ষাঃ

যে কোনও গল্প শোনার পর বা সরব পাঠ করার পর, শিশুকে ছবি দেখিয়ে 'কেন' প্রশ্ন করা যেতে পারে। উত্তরের মান অনুসারে শিশুদের চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ঘ) প্রশ্ন করতে পারার ক্ষমতাঃ

'যতখুশি প্রশ্ন বানাও'- এইভাবে সমীক্ষাটি দিতে হবে। ধরুন, আপনি এমন একটি ছবি দিলেন যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি বৃদ্ধ ব্যাগ ভর্তি বাজার নিয়ে গ্রামের পথে ছুটছে। আকাশে কালো মেঘ জমেছে। এবার শিশুদের কমপক্ষে পাঁচটি প্রশ্ন করতে দিতে হবে। যেমন লোকটি কোথায় যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, ইত্যাদি। প্রশ্নগুলি শোনার পর তাদের মান অনুসারে শিশুদের চার ভাগে ভাগ করতে হবে।

ঙ) পারস্পারিক সম্পর্ক নিরূপণ সমীক্ষাঃ

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণীর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক নিরূপণ করার সমীক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন, এমন একটা ছবি দেওয়া যেতে পারে যার দুটি অংশ রয়েছে। একটিতে দেখা যাচ্ছে, বাঘ হরিণ ধরছে এবং আর একটিতে হরিণ ঘাস খাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল, বাঘের সঙ্গে ওই জঙ্গলে ঘাসের সম্পর্ক কী? উত্তর শোনার পর শিশুদের মান অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

৪) 'রূপায়ণ ও প্রয়োগ দক্ষতা সমীক্ষা'য় শিশুকে এমন কোনও সমস্যা দিতে হবে যেখানে সে হাতের কাছে পাওয়া দ্রব্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারে। নীচের সবক্ষেত্রেই শিশুর মান অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) হাতের কাজের সমীক্ষাঃ

ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে নানান দ্রব্য তৈরি করা এবং তাতে রঙ করার সমীক্ষা করানো যেতে পারে।

খ) ছড়া তৈরির সমীক্ষাঃ

সমজাতীয় শব্দ ব্যবহার করে মজার ছড়া তৈরি বা যে কোনও গল্পকে ছড়ায় রূপান্তরিত করতে পারার ক্ষমতা।

গ) মূকাভিনয় করে ঘটনা বর্ণনার সমীক্ষাঃ

কোনও মূকাভিনয় দেখে নতুন একটা মূকাভিনয় করে দেখানো এবং গল্পটার বর্ণনা করা।

ঘ) বিকল্প সমাধানসূত্র আবিষ্কারের সমীক্ষাঃ

জাতীয় পতাকা তৈরি করতে হবে। কিন্তু বিদ্যালয়ে কোনও রঙ নেই। তাহলে এখন কী করা যাবে?

ঙ) বিমূর্ত ধারণা গড়ে তোলার সমীক্ষাঃ

কোনও একটা ছড়া বা কবিতা দেওয়া হল। এবার তাতে নিজের মতো চেনা লৌকিক সুর বসাতে বলতে হবে।

৫) 'সুপ্ত মূল্যবোধের ও সমীক্ষা'র জন্যঃ

শিক্ষক কিছু ছবি ও কাহিনী বা অভিনয় দেখাতে পারেন নিম্নলিখিতভাবে। সবক্ষেত্রেই শিশুর কথা ও আচরণ দেখে মান অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করতে হয়।

ক) দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপের মাধ্যমে মূল্যবোধ কী তা বোঝার সমীক্ষাঃ

একটি দৃশ্য-শ্রাব্য ক্লীপ দেখিয়ে শিশুর কী মনে হচ্ছে তা মন্তব্য করতে বলতে পারেন। অবশ্য ওই ভিডিওটির মধ্যে এমন কিছু মূল্যবোধের বিষয় লুক্কায়িত থাকবে যা শিশুকে খুঁজে বের করতে বলতে হবে।

## খ) ছবি দেখিয়ে মূল্যবোধ বিচারের সমীক্ষাঃ

যেমন ছবিতে দেখা যাচ্ছে হাড় জির জিরে ভুখা মানুষেরা বসে আছে, হাতে থালা, পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে। এখানে এই ছবিটি দেখে শিশুটি ছবির মধ্যে বিভিন্ন মানুষের সমস্যা ও আচরণ নিয়ে মন্তব্য করবে।

## গ) কাহিনী শুনিয়ে মূল্যবোধ বিচারের সমীক্ষাঃ

ধরুন আপনি বললেনঃ "চিড়িয়াখানায় গিয়ে একটি দুষ্টু ছেলে গেরিলার বাচ্চার দিকে ঢিল ছুঁড়ছিল। বাচ্ছা পশুটি ক্ষেপে গিয়ে আওয়াজ করতে লাগল। তার মা এসে তাকে কোলে শুইয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল"। এই গল্প থেকে শিশুটির কী মনে হল তা জানতে চান। এইভাবে শিশুর মূল্যবোধের বিচার করুন।

উপরের বিষয়গুলি থেকে প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে একটি দুটি করে বাছাই করে প্রতিটি শিশুর সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। সমীক্ষার জন্য গল্প বলা, গান শোনানো, হরবোলার ডাক শোনানো, বাদ্যযন্ত্র শোনানোর জন্য রেকর্ড করা বিষয় ব্যবহার করতে পারেন। সরব পাঠ সমীক্ষার জন্য টেপ রেকর্ডারে বা মোবাইলে রেকর্ড করে পরে তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। কোনও ছবি বা প্রাকৃতিক ও সামাজিক দৃশ্য দেখিয়ে প্রশ্ন করার জন্য মোবাইল ব্যবহার করা যেতে পারে। এরপর শিশুদের মান অনুসারে চারটি স্তরে ভাঙতে হবে শিশুদের এবং সেগুলি লিখে রাখতে হবে শিক্ষকদের রেজিস্টারে। এরপরই শিক্ষকরা বুঝতে পারবেন শিশু কোন কোন সামর্থ্যে শক্তিশালী এবং কোনটায় নয়। যে সমস্ত সামর্থ্যে শিশুদের ঘাটতি আছে সেগুলি মাথায় রেখে উপভাবমূল ভিত্তিক কৃত্যালিগুলি সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে এক একটি সামর্থ্যের জন্য একাধিক মানের কৃত্যালি নির্মাণ করতে হতে পারে। এই চিন্তন ও পরিকল্পনাকেই শিক্ষকের 'পাঠ পরিকল্পনা' বলে। এই মুহূর্তে পাঠ্যবই পড়ানোর ক্ষেত্রে তেমন কোনও 'পাঠ পরিকল্পনা' তৈরির উদ্যোগ শিক্ষকদের মধ্যে নেই। তবু 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্' গৃহীত প্রকল্পে প্রথমেই পাঠ্যবই বহির্ভূত কৃত্যালিগুলির একটি 'পাঠ পরিকল্পনা' তৈরি করা প্রয়োজন। এরজন্য শিক্ষকদের একটি প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রতিটি পাঠের আগে যে ক'দিন পাঠ্যবই বহির্ভূত কৃত্যালির চর্চা হবে, সে ক'দিনের জন্য এই পরিকল্পনা জরুরি।

# সর্বশেষে মোটকথাঃ

পরিশেষে বলা যায়, একটি শ্রেণিকক্ষ দেখতে কেমন হবে তা নিয়ে যুগে যুগে শিক্ষাবিদ্‌রা নানান প্রস্তাব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে সারা প্রকৃতিই একটি শ্রেণিকক্ষ। গান্ধীজী চাইতেন হাতে-নাতে কাজ করতে করতে শিশুরা প্রয়োজনীয় পাঠ গ্রহণ করুক। উভয়ক্ষেত্রেই পরিবেশ ও জীবনের শিক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে। বিদ্যাসাগর ইউরোপীয় কায়দায় নৈতিক পাঠের গুরুত্ব দিয়ে প্রথাগত বিদ্যালয় ব্যবস্থারই সুপারিশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো বিদেশে এবং এদেশেও প্রথাভাঙা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা অনেকেই করেছেন। জন হল্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'How children learn'-এ বিদ্যালয়ের আধুনিক ফরম্যাটকেই ভাঙতে চেয়েছেন। এযুগে 'শিক্ষান্তর' এর মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি, মনীশ জৈন, সদগুরু যাজ্ঞী বাসুদেব, সোনম ওয়াংচুর মতন শিক্ষাবিদ্‌রা প্রথা ভেঙে বিকল্পের সন্ধান করেছেন। তাঁদের কাছেও সারা জগৎ ও জীবনই শিক্ষাভূমি। শিশুর নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা ও সামর্থ্য দিয়ে তার শিক্ষার মূল ভিত্তি তৈরি হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যাপক ও উদার ভাবনা যে ব্যতিক্রমী, এটা অস্বীকার করা যায় না। ব্যতিক্রম সহজে আইনে পরিণত হয় না। রবীন্দ্রনাথও তাই আমাদের দেশে ব্রাত্য। অথচ বিদ্যাসাগর এখনও সগৌরবে গৃহীত। ইতিহাস বলে এভাবেই একদিন পরিবর্তন আসবে। শুরুতেই যাঁরা হাঁটেন তাঁদের মূল্যায়ন সবসময় সঠিকভাবে হয় না। অন্যদিকে সংস্কৃতির পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয়। যা আছে তা স্বীকার করে নিয়েই এই পরিবর্তন আসে। তাই শিক্ষায় পরিবর্তন হয়তো র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সম্ভব নয়। তার বড় কারণ ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র এখনও পুরোপুরি শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। করতে গেলেই 'হিতে বিপরীত' হত। ফলে এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে আসবে। তাই প্রথাগত বিদ্যালয় ও প্রথাগত শ্রেণিকক্ষের মূল কাঠামোকে স্বীকার করে নিয়েই 'অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভ্‌স্' এক বিকল্পের সন্ধান করছেন। এই সন্ধানের মধ্যে তাই যেমন বিদ্যাসাগর আছেন তেমনই আছেন গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ যেমন ব্রুনার (Bruner) আর পিঁয়াজের (Piaget) মেধা বিকাশের তত্ত্ব আছে, তেমনই আছে ভাইগটস্কির (Vygotsky) সামাজিকভাবে জ্ঞান নির্মাণ তত্ত্ব, একদিকে যেমন প্রথাগত ব্যবস্থায় আস্থা রেখে এগোনোর চেষ্টা তেমনই প্রথা ভেঙে শিক্ষার অঙ্গনে ব্যাপকভাবে মুক্ত হাওয়ার সঞ্চার ঘটানো। কিছুটা সংস্কারপন্থীদের তাগিদ অনুসরণ করেই মাঝামাঝি একটা পথ প্রাথমিকভাবে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্' গ্রহণ করেছেন। এই পথে যাঁরা সরাসরি পথ দেখাচ্ছেন তাঁরা হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আর রাশিয়ার সমাজ মনোবিজ্ঞানী লেভ ভাইগটস্কি।

নির্মিতিবাদে (Constructivism) বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গীকে পাথেয় করেই ২০০৫-এর 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা' সহ ২০১১ সালে এরাজ্যে পাঠক্রম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা খুঁজতে নির্মিতিবাদীদের মধ্যে যিনি সব থেকে বেশি কার্যকরী হতে পারেন তিনি হলেন লেভ ভাইগটস্কি (Lev Vygotsky)। তিনটি কারণে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্' তাঁর দর্শনের কাছে ঋণীঃ

ক) ভাইগটস্কি বলেছেন, যে শিশু নিজে নিজেই শিখতে পারে এবং শিক্ষনীয় বিষয়কে তাই শিশুর জানা জগতে অবস্থিত আধা-আলো আধা-আঁধারিতে পূর্ণ জ্ঞানের জগতে এমনভাবে স্থাপন করা প্রয়োজন যাতে শিশু সহজেই তা আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক ও স্থানিক বাস্তবের স্তর থেকে উপস্থাপনা করলেই এই Zone of proximal development-এর সীমা অতিক্রম করে শিশু নিজের শিখন নিজেই করতে পারবে। 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্' সেটাই করতে চায়।

খ) শিশু সামাজিকভাবে বেশি শেখে। শিশুর চারপাশের বস্তু জগৎ, প্রকৃতি ও সমাজ থেকে সাহায্য নিয়ে সে নিজেই শিখতে পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই কোনও না কোনও অধিকতর জ্ঞানী মানুষকে তার পাশে প্রয়োজন হয়। এই জ্ঞানীদের মধ্যে শিক্ষক যেমন আছেন, তেমনই আছে তার সহপাঠীরা। এদের মধ্যে কেউ কেউ কোনও কোনও বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিশুর চেয়ে বেশি জ্ঞানী। তাদের সঙ্গে দল বেঁধে সে সহজেই ওই জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্' এখানে এই ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় শিশুর জ্ঞান নির্মাণ পদ্ধতির ওপরই জোর দিয়েছে। শ্রেণিকক্ষে হোক বা বাইরে সবক্ষেত্রেই দল গঠন, দলগত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

গ) সামাজিক প্রক্রিয়ায় সব চেয়ে বড় মাধ্যম হল ভাষা। কিছু কিছু ইঙ্গিত ও সংকেতও ভাষার বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে ভাষার চর্চা ছাড়া এই সামাজিক জ্ঞান নির্মাণ সম্ভব নয়। শিশুকে যাই করতে হোক না কেন তার জন্য লাগে বয়ঃক্রম অনুসারে উপযুক্ত শব্দভাণ্ডার। ভাইগটস্কিও সামাজিক আদান-প্রদানে ভাষার ভূমিকাকে সর্বাধিক বলে মনে করেছেন। এই প্রকল্পে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্'-ও 'শব্দজাল চর্চা ও শব্দভাণ্ডার নির্মাণ'-এর উপর জোর দিয়েছেন এবং সামাজিক ভাব বিনিময়ে উপযুক্ত শব্দচর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

অন্যদিকে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিশুমনের স্বাধীনতা, ইচ্ছার মুক্তি, প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিখন আর নানান সৃজনমূলক লোকসংস্কৃতির চর্চার কথা বলেছেন। শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে শিশুদের বন্দিত্বের বিরুদ্ধে তিনি যেমন সোচ্চার তেমনই বাঁধাধরা ছকে বিদ্যালয় পরিচালনারও বিপক্ষে তিনি। মুক্ত আঙ্গিকে শিক্ষার যে মূল ভাবনা তাকে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্' বর্তমান প্রকল্পে তা যথাযোগ্য মর্যাদায় গ্রহণ করেছে এবং সমগ্র কৃত্যালির মধ্যে তাকে যোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে।

তাই এই আদর্শের নিরিখে শ্রেণিকক্ষকে হতে হবে একটি গবেষণাগার।

ক) শিশুর মস্তিষ্কে জিজ্ঞাসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান, সত্য যাচাই, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সত্য নির্মাণের মাধ্যমে যে কোনও বিষয়ে নতুন পথের দিশা দেওয়ার উপযোগী একটি শ্রেণিকক্ষ ও তার উপযুক্ত সামগ্রী থাকা প্রয়োজন।

খ) মস্তিষ্কে 'ভাষা ভাণ্ডার' নির্মাণ যেহেতু অন্যতম প্রধান কাজ, তাই পাঠ্যবইয়ে ভাবমূল ও উপভাবমূলগুলিকে কেন্দ্র করে কিছু শব্দকার্ড, পঠনকার্ড, ছোট ছোট গ্রন্থাগার পুস্তিকা, ছবি সমন্বিত গল্পকার্ড, ছড়ার কার্ড, বর্ণ বিশ্লেষণের কার্ড, ছড়া ও গানের অডিও, ভিডিও ক্লীপ, পঠন মান অনুসারে হরেক রকমের সহজ ও সহজতর পাঠ, শব্দের তালিকা, ছড়া নির্মাণের সূত্র, গল্প নির্মাণ সহায়ক সূত্র কার্ড, পঠন অনুধাবনের জন্য এলোমেলো ভাঙাচোরা পাঠ্যাংশ কার্ড, বিরাম চিহ্নিতকরণ কার্ড, টেপ রেকর্ডার, স্টপ ওয়াচ, কম্পিউটার, প্রজেক্টর ও স্ক্রীন ইত্যাদি সরঞ্জাম শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সংরক্ষিত রাখতে হবে। দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে ব্যবহৃত হতে পারে রেডিও।

গ) বিদ্যালয়ের বাইরে পর্যবেক্ষণ ও সামাজিক কথোপকথনকে সুদৃঢ় করতে শ্রেণিকক্ষের মধ্যে নির্বাচিত ভাবমূল ও উপভাবমূলগুলির জন্যে তৈরি করতে হবে নানান সমীক্ষাপত্র। সমীক্ষাপত্রের ভাষা হবে সংক্ষিপ্ত ও সহজ। এক কথায় বা টিক দিয়ে যাতে তারা তাদের ভাবনা লিপিবদ্ধ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তথ্য সংগ্রহের সরল প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেবেন। পরে শ্রেণিকক্ষে ফিরে এসে দলে বসে তারা তৈরি করবে তাদের নোটবুক এবং তাদের সংগৃহীত নিদর্শনগুলি গুছিয়ে রাখবে কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে।

ঘ) তাছাড়া নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অব্যবহৃত, ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র, ও নানা উপাদান দিয়ে তৈরি করা মডেলগুলিও গুছিয়ে রাখবে তারা।

ঙ) শ্রেণিকক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে উপভাবমূল ভিত্তিক নাটক, গান, বাজনা, ছড়া, আবৃত্তি, বিতর্ক সভা, গল্প বলার আসর, সৃজনমূলক খেলা আরও অনেক কিছু। যেমন নাটকের জন্য গাছের দৃশ্য লাগতে পারে। শক্ত কার্ডবোর্ডে গাছ তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন মুকুট দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রকে চিহ্নিত করা যায় কিনা দেখতে হবে। এছাড়া পোষ্টার, শ্লোগানও তৈরি করা যায়। ছড়া আর গল্পের জন্যে কার্ড তৈরি করা যেতে পারে। ব্যবহারের জন্যে কিছু সস্তার বাদ্যযন্ত্র যেমন ঘুঙুর, বাঁশি, তবলা, ঢোল ইত্যাদি আনা যেতে পারে। এতে শিশুর মধ্যে সুর বা ছন্দের ধারণা স্বাভাবিকভাবে তৈরি হবে। ওটাই এর উদ্দেশ্য।

চ) শ্রেণিকক্ষে ঢুকলেই দেখা যাবে সারা দেওয়াল জুড়ে বিভিন্ন বোর্ডের বিভিন্ন নিদর্শন ঝুলছে। দেওয়াল আলমারিতে রাখা আছে পূর্বে উল্লেখিত সামগ্রী। শিশুরা গোল হয়ে দলবেঁধে বসে আছে। প্রত্যেক দলের কাছে এক একটা চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ সমাধানের জন্য বিভিন্ন স্তরের শিখন সামগ্রী দেওয়া আছে। শিশুরা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা করে ওই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে এবং নিজস্ব মতামত তৈরি করছে।

ছ) শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ে গড়ে তুলতে হবে মান অনুসারে 'গ্রন্থাগার' 'সামাজিক সংগ্রহশালা', 'ভাষা ভাণ্ডারের জন্য

উপযুক্ত শব্দকার্ড'। থাকবে 'পরিবেশ কর্ণার'। নতুন উদ্যোমে শ্রেণিকক্ষকে একটি গবেষণাগারে পরিণত করতে হবে। এই গবেষণাগার তৈরি হবে শিশু এবং শিক্ষক উভয়ের বোধের জন্য। একবিংশ শতাব্দীর শ্রেণিকক্ষ না হলে এই শতকের বিশ্বজনীন মানুষ তৈরি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা এখানে নেই।

সর্বোপরি সব শেষে বলা যায়, এই শ্রেণিকক্ষে বা কক্ষের বাইরে শিক্ষক শুধুমাত্র একজন পথপ্রদর্শক নন, তিনি শিশুর ভাল লাগার জীবন্ত দীপের মতন। সমবেতভাবে চলার সাথী, এককভাবে উপলব্ধির মডেল, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের এক অবিসংবাদিত ও নির্বিকল্প সহায়ক। এই দিশা-পুস্তকটি যদি সেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজে লাগে তবে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্' সব থেকে বেশি সার্থকতা অনুভব করবে।

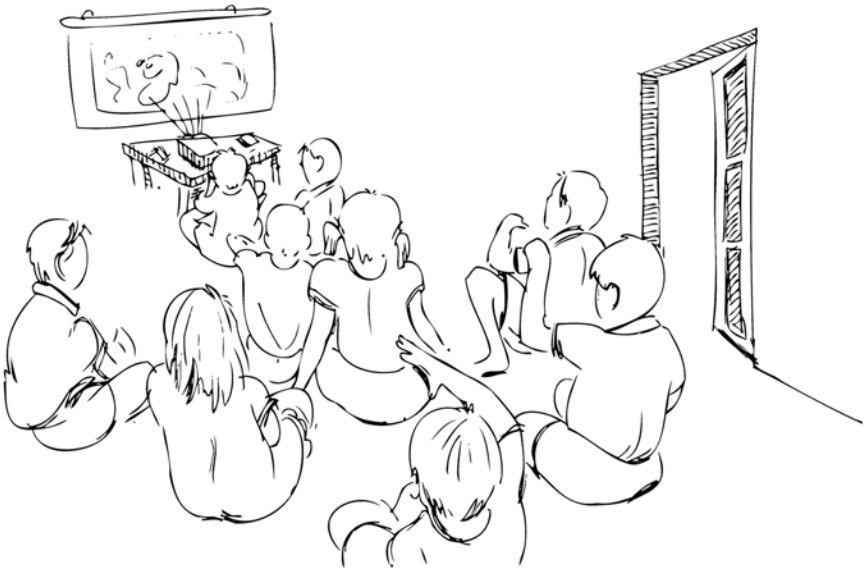

নবদিশা

## নবদিশার ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯